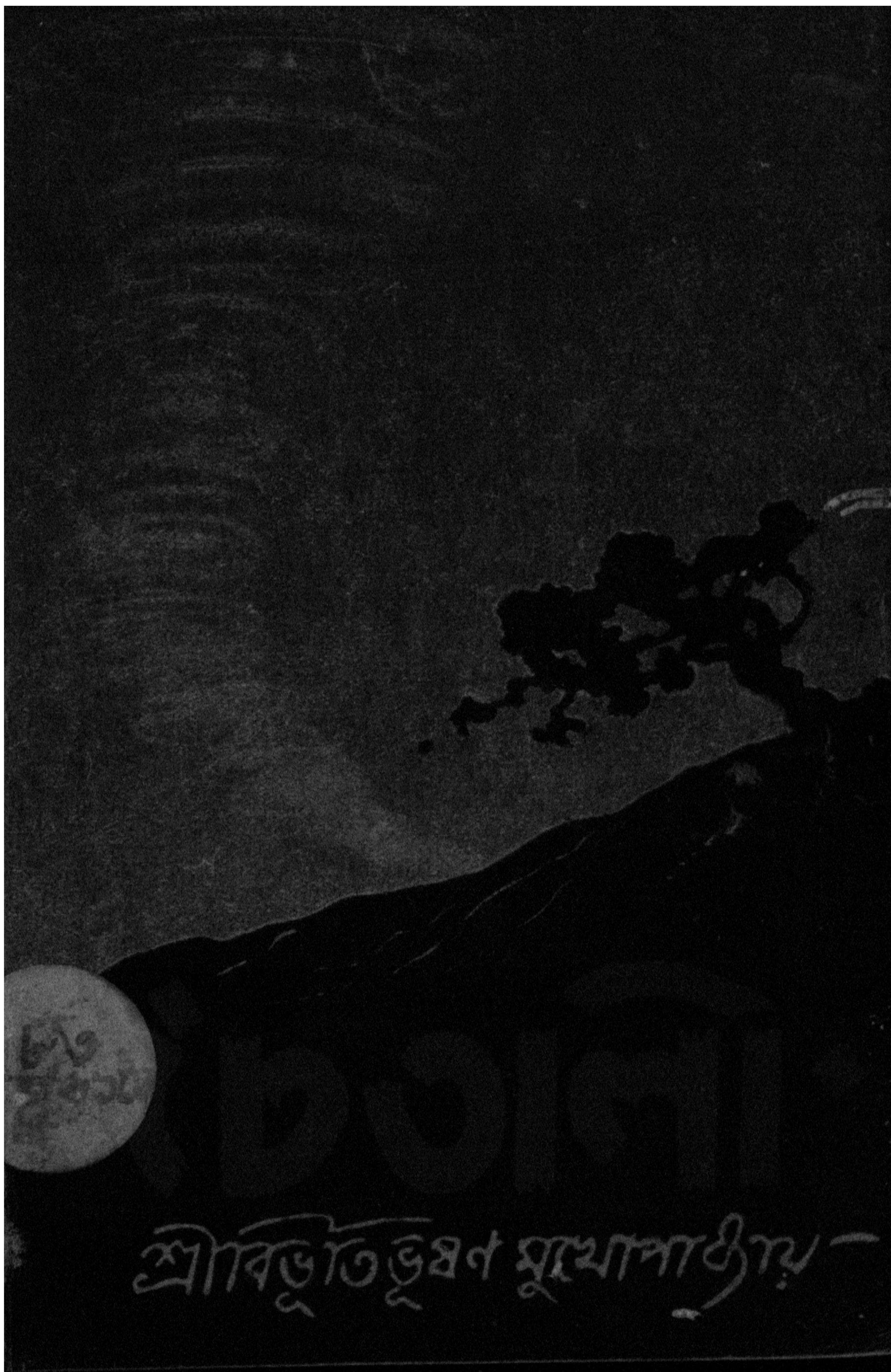

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চৈতালী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়কৃষ্ণবসু-চিত্রিত



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা
[কাগজের মলাট]

* *
*

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৫৭

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

'চৈতালী' বইখানি

প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

হস্তে সমর্পণ করিলাম

ব. ভ. ম.

মহালয়া,
১৩৫০

চৈতালী

ফাল্গুন গিয়া চৈত্র পড়িয়াছে। কয়েক দিন মাত্র হইয়াছে কিন্তু তবুও রোদের দিকে চাওয়া যায় না। অদূরে জুট মিলটার গায়ে রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; কলের ক্লান্ত নিঃশ্বাসের মত অভ্রংলিহ লাগান চিমনিটা দিয়া একটা তাম্রাভ ধুঁয়ার অস্পষ্ট রেখা মন্থর-গতিতে কুণ্ডলি পাকাইতে পাকাইতে আকাশে মিশাইয়া যাইতেছে। প্রশস্ত মাঠটার সবুজ রঙে একটা অস্বস্তিকর চিক্‌চিকে শ্বেতাভা—মনে হয় তৃষ্ণার্ত কি-একটা এই কাঁচা হরিৎ তাহার লালাক্ত জিব দিয়া যেন চাটিয়া বেড়াইতেছে। দূরে গঙ্গার দিকেও চাওয়া যায় না—রুক্ষ আকাশের নীচে জলের রেখাটা দুলিতেছে যেন একখানি কম্পমান মরীচিকা।

মাঠের ও-প্রান্তে একটা পত্রহীন পলাশ গাছের মাথায় এক থোকা টকটকে ফুল এখনও কি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছে। বেশ একটা প্রীতিপ্রদ ভাব জাগায় না, মনে হয়—দগ্ধাবশিষ্টের শেষ অগ্নিরেখা।

অশ্বিনী বলিল, "এবার চৈত্রের রূপ দেখেছ? বৈশাখ যে তা হ'লে কি বেশে আসবেন বলতে পারি না।"

তারাপদ বলিল, "জানালাটা বরং বন্ধ ক'রে দিই, সত্যি চোখে বড় লাগছে আলোটা। সমস্ত বছরটাই প্রায় শুকো গেল, হবেই ত এ রকম।"

উঠিতেই শৈলেন বলিল, "থাক না, তোমরা না হয় এ দিকে মুখ ক'রে ঘুরে বস!"

তারাপদ অশ্বিনী, অক্ষয় তিন জনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল।

তারাপদ বসিতে বসিতে বলিল, "তোমাদের অন্ত পেলাম না শৈলেন;—বর্ষা সরস, তাতে রস পাও বুঝি, কিন্তু এই জ্বলন্ত আকাশ আর ধরিত্রী,—চাইলে চোখ ঠিকরে পড়ে, এতে তোমরা কি রসের, কি কবিত্বের যে সন্ধান পাও মাথায় ঢোকে না। নাঃ, তোমাদের নিয়ে যে কী মুশকিলেই—"

শৈলেন স্থিরদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, মুখটা অল্প ফিরাইয়া লইয়া একটু হাসিল। সত্যই একটু আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারাপদর পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিল, "মুশকিল বরং তোমাদের নিয়েই—প্রত্যেকটি ব্যাপার তোমরা মানুষ বা জীব-জন্তুর সুখসুবিধের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে। জল হয় নি—অর্থাৎ তোমাদের ধান মুগ-মুসরির অসুবিধে হয়েছে, কি, তোমাদের গরু-ঘোড়ার একটু ঘাসের অভাব হয়েছে, ব্যস্ তোমরা চোখে অন্ধকার দেখছ বলে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য লোপ পেলে! ধর যদি একটা বৃহত্তর প্রয়োজনে বা কোন এক বিরাটতর সত্তার—পুরুষেরই বল—অদ্ভুত সৌন্দর্যলিপ্সা মেটাবার জন্যেই এই রুক্ষতার সৃষ্টি হয়ে থাকে ত তাঁর সেই বিরাট আনন্দের সঙ্গেই আমাদের মনের সুর বাঁধবার চেষ্টা করাটাই কি বেশি সংগত⋯"

এমন সময় অক্ষয় হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া জানালার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ, উস্!⋯"

সকলে নির্দিষ্ট পথে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিশ্চল হইয়া গেল। একটা মুষলাকৃতি বিরাট দেহ তাণ্ডবের মত্ত আনন্দে জ্বলন্ত মাঠের উত্তর হইতে দক্ষিণে চক্রগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ধূলিপাটল অঙ্গ হইতে জীর্ণপত্রের ছিন্ন বসন ক্রমাগত পড়িতেছে খসিয়া, আর ক্রমাগতই সে

শিকড়ের মত শীর্ণ, বক্র অঙ্গুলি দিয়া সেটাকে জড়াইয়া লইতেছে। পাতায় পাতায় সংঘাতের ফলে যে একটা উগ্র মর্মর উঠিতেছে সেটা এত দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়।

তারাপদ বলিল, "এ রকম ঘূর্ণি অনেক দিন দেখি নি—কখনও দেখেছি কি না মনে পড়ে না।"

অক্ষয়ের একটু যেন ঘোর লাগিয়াছিল, বলিল, "ঘূর্ণিই তো?... দেখ দেখ, কপালে আগুন জ্বলছে!"

একটানা নয়, তবে একটু থাকিয়া থাকিয়া সত্যই রুদ্রের তৃতীয় নয়নের মত ঘূর্ণিটার ললাটে একটা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। যত আবর্জনা দেহ-লগ্ন করিতে করিতে গতিটা হইয়া উঠিতেছে আরও প্রমত্ত।

তারাপদও একটু কি রকম হইয়া গিয়াছিল, কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, "শুনেছি সব ঘূর্ণিই—ঘূর্ণি মাত্র নয়।"

আবার নিজেই সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "অবশ্য মেয়েলী কথা।"

অক্ষয়ের ঘোরটা তখনও কাটে নাই, একটু বিরক্তির কণ্ঠেই বলিল, "মেয়েলী! কপালের ঐ আলোটা তাহ'লে কি? ঐ দেখ, আবার... ঐ—ঐ—"

শৈলেন বলিল, "আগুনই। কোন্ উনুনের তাও সন্ধান পেয়েছি আমি।"

সকলে তাহার মুখের দিকে চাহিল। শৈলেন পলাশ গাছটার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, ফুলের সেই গোছাটা কোথায়?"

সকলেই দেখিল ডালের বেশ খানিকটা পর্যন্ত লইয়া ফুলের সমস্ত স্তবকটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! অক্ষয় প্রশ্ন করিল, "বলতে চাও, ঘূর্ণিতে ডালশুদ্ধ মুচড়ে নিয়ে চলে গেছে?"

শৈলেন মাথা দোলাইল, বলিল, "বাংলার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ঘূর্ণি এত

বেশি বোধ হয় পারে না, তবে অন্যত্র সে গাছকে-গাছ উপড়ে নিয়ে নাচের সহচর করেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা।"

সকলে ধরিয়া বসিল—গল্পটা তাহা হইলে বলিতে হইবে, চৈতালী গল্পই চলুক আজ।

*　　　*　　　*

শৈলেন মাথার তলায় মোটা তাকিয়াটা ভাল করিয়া বসাইয়া লইল, যাহাতে দৃষ্টিটা বেশ সোজাসুজি জানালার বাহিরে গিয়া প'ড়তে পারে, বলিল, "সে গল্পটা বলতে গেলে আমাকে আগে অক্ষয়ের ক্ষমা ভিক্ষে ক'রে নিতে হয়। তার মানে, যদিও সে ঘূর্ণিটা বোধ হয় একটা আট-পৌরে চৈতালী ঘূর্ণি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তবু সমস্ত ব্যাপারটার যোগাযোগের মধ্যে এমন কতকগুলো কাণ্ড হয়েছিল যার টীকা আমি এখনও সম্পূর্ণ ভাবে ক'রে উঠতে পারি নি।"

শৈলেন রহস্যের স্মৃতিতেই যেন একটু থামিয়া গেল, তাহার পর আবার আরম্ভ করিল—"সেবার হঠাৎ নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনের খেয়াল চাপল।—চমকো না, ভক্তির টান নয়। শিব উদাসীন, কিন্তু আমি ওঁর বা ওঁদের সম্বন্ধে তার চেয়ে লাখোগুণ উদাসীন এ কথা জানই। ঝোঁক চাপল দলে প'ড়ে। মেয়ে পুরুষে বেশ একটি বড় দল হ'ল আমাদের। ওদের অবশ্য লোভ সাক্ষাৎ শিবকে দেখবে, আমার শখ দেখব হিমালয়। অন্তত এই উদ্দেশ্য নিয়ে তো বেরুলাম।

"কিন্তু জান, ধর্ম জিনিসটা বড় সংক্রামক। চার দিন লাগল আমাদের হিমালয়ের গোড়ায় পৌঁছতে। এই চার দিনেই দলের সবার মুখে ক্রমাগত শিবের কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে অল্প অল্প ক'রে রং ধরতে লাগল। তার পর দল ক্রমেই বাড়তে লাগল আর আলোচনাও ঘোরাল হয়ে উঠতে লাগল, শেষে এমন হ'ল যে যখন হিমালয়ের গোড়ায় পৌঁছলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সবার মতনই আমিও এক রীতিমত

শৈব হয়ে প'ড়ছি। আমার মানসিক পরিবর্তন আর সেই সঙ্গে নিষ্ঠা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে—বাবাই আমায় ঘরছাড়া ক'রে টেনে নিয়ে এসেছেন।

"ক্রমে কথাটা আমিও বেশ জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করলাম এবং বোধ হয় দেবতার এই বিশেষ অনুগ্রহের বিশ্বাসেই আমার আকাঙ্ক্ষাটা সব সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে অসম্ভবের কোটায় গিয়ে উঠল। আকাঙ্ক্ষা না ব'লে যদি আবদার বলি ত বোধ হয় আরও ঠিক হয়। হিমালয়ের নীচেকার গোটাকতক পাহাড় অতিক্রম করতে করতেই তার বিরাটতা'য় আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলাম। কতকটা যেন একটা নেশার ভাব আমার মাথায় ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল,—খুব বড় একটা কিছুর নেশা। মনে হ'ল এই তো আমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে যা বিরাট্, সব চেয়ে যা রহস্যময়—দেবতাদের লীলাভূমি, শঙ্কর-উমার তপঃপ্রাঙ্গণ যে হিমালয় তার গহ্বরে বিচরণ করছি : এখানে এসেও কি আমায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ একটা মন্দিরের মধ্যে স্বল্পায়তন একটি শিলা-বিগ্রহকে দেখেই দেবদর্শনের সাধ মিটিয়ে যেতে হবে? আমার প্রতি যদি দেবতার এতই করুণা যে আমার কঠিন ঔদাসীন্যের মধ্যেও তাঁর আকর্ষণকে এমন প্রবল আর অমোঘ ক'রে তুলেছেন তো তিনি আমার কাছে নিজের স্বরূপে প্রকট হ'ন। কালের অপ্রমেয় অতীতে এই দেবভূমির উপর লোকাতীত যে সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়েছিল তার অল্প একটুও আবর্তিত ক'রে আমার নয়নের সামনে ধরুন। আমি চরিতার্থ হব। তপঃক্ষীণা ধ্যানরতা উমার প্রশান্ত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিই হোক, ভিক্ষার্থী শঙ্করের সামনে শিবানীর অন্নপূর্ণা মূর্তিই হোক বা মদন-ভস্মের সময় যোগিবরের প্রলয় মূর্তিই হোক,—কালের যবনিকা তুলে আমায় দেখান একবার। তার জন্যে যা তপস্যা তা আমি করব। আমার জাগ্রত চেতনায় যদি সম্ভব না হয় ত স্বপ্নেই হোক বা আমার চেতনাকে সম্মোহিত করেই হোক, আমায় দেখান। আমি

সেটাকেও সত্যরূপেই গ্রহণ ক'রে, আমার তীর্থ অভিযানের পরম সঞ্চয় ক'রে রাখব। তাঁর লীলাক্ষেত্রে এসেও যদি আমায় মাত্র স্থাবর শিলামূর্তি দেখেই ফিরতে হয় ত ভাবব আমি বঞ্চিত হলাম।

"যতই এগুতে ল'গলাম, হিমালয়ের বিস্ময় যতই আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল, আমার মনটা ততই যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।... এই ত এসে পড়লাম ব'লে—ভিড়ের পেছনে শিলামূর্তিকেও ভালোভাবে না পেয়ে আর শিলমূর্তির পেছনে দেবতাকেও হারিয়ে দু দিন পরে ফিরে যাব। শূন্যহাতেই যাব ফিরে। এই জন্যই কি সুদূর বাংলা ছেড়ে এত আশা এত উদ্যম নিয়ে আসা? যে দেবতার প্রসাদ লাভ করেছি ব'লে সবাই বলছে, এক এক সময় যে-দেবতাকে অন্তরতম অন্তরে পাই বলেও যেন অনুভব করি, তাঁর কি ক'রে পূজো করবো, যদি এই দারুণ নিরাশা মনকে তিক্ত ক'রে রাখে? বরকে অভিশাপে পরিণত করবার জন্যেই কি তিনি আমায় এখানে নিয়ে এলেন?...আমার খাওয়া কমে এল, পথ অতিক্রম করার উৎসাহ কমে এল, দলের পক্ষে আমি যেন একটা বোঝা, এবং সমস্যা হয়ে উঠতে লাগলাম; যে-দল বিশেষ ক'রে আমার উপরই একটা অলৌকিক শক্তির আকর্ষণ ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছিল।

"এরই মধ্যে কিন্তু আমার মনে এক এক সময় আবার হঠাৎ কোথা থেকে একটা জোয়ার ঠেলে উঠত; একটা প্রবলতর বিশ্বাসের জোয়ার। সমস্ত মনটা লোকোত্তর কিছু একটা দেখতে পাবে বলে যেন উদগ্র হ'য়ে উঠত, মনে হ'ত এই এক্ষুনি দেখতে পাবে,—সে এক অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি যাতে না দেখতে পাওয়াটাই আশ্চর্য মনে হ'ত।....এই যে প্রত্যক্ষ সমস্ত ঘটনা—এই রুক্ষ ইন্দ্রিয়াধীন হিমাচল, এই দলের পর দল আমাদের যাত্রীদের অভিযান, তাদের প্রতি দিনের চলার ইতিহাস, চটিতে এসে নিতান্ত পার্থিব ব্যাপারগুলার অনুষ্ঠান—এই সবগুলোকেই কেমন যেন অলীক আর অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ত। ঠিক যেন এসব

মিলিয়ে আসছে আর সামনেই অন্য এক নাট্যশালায় একটা পর্দার দোল অনুভব করা যাচ্ছে। এখুনি পর্দা উঠবে আর আরম্ভ হবে, নটরাজের খেলা। বেশ অনুভব করছি, এই যে পেছনের জগৎ আমার, এটা সে-খেলার সামনে প্রেক্ষাগৃহের মতনই আমার চেতনা থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

"তোমরা বলবে—আশা নিরাশার সঙ্গে উপবাস আর পথশ্রান্তি মিলে আমার মস্তিষ্ককে বিকৃত ক'রে আনছিল ; সম্ভব।

"এই সময় একটা ব্যাপার হ'ল যার দ্বারা আমি আমার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তোমাদের বলতে ভুলে গেছি যে মেলা লোককে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আমাদের যাত্রা করতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল! ফলে, যদি বলা যায় যে সব যাত্রিদলের মধ্যে আমরাই প্রায় শেষ দল ছিলাম ত বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না। পৌঁছিবার আগের দিন দুপুর বেলায় আমরা যে চটিতে এসে উঠলাম সেখানে খবর পেলাম যে একটা আকস্মিক প্রবল ঝড় আর বৃষ্টিপাতে সামনের রাস্তায় একটা বড় রকম ধস্ হয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে! এ রকম জায়গায় একটা আতঙ্কের কথা শুনলে তার সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করবার আর সাহস থাকে না মনে। স্থির হ'ল আমরা একটা অন্য পথে দিয়ে ঘুরে যাব, তাতে আমাদের একটা দিন বেশি লাগবে। আমি ছাড়া সবাই বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল।"

তিন জনেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "তুমি ছাড়া!"

শৈলেন উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমি ছাড়া বৈকি।"

তিন জনেই আবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "তার মানে?"

শৈলেন উত্তর করিল. "আমার মনে হ'ল আমার মনের আবেদন যেন যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। যদি এখন এও ভেবে থাকি যে পাহাড়ের এই ধস্ কোন এক মহাশক্তির আবির্ভাবই সূচিত করছে তো কিছু আশ্চর্য

হয়ো না। আমার মনটা তীক্ষ্ণ প্রত্যাশায় আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐ ধস্ আমাদের যাত্রাপথে যা একটা এত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল সেটা কার পদচিহ্ন মাত্র? তাকে দেখতেই হবে, তা সে যতই ভৈরব হোক না কেন।

"পথ অত্যন্ত খারাপ, ক্রমাগতই যেন মনে হচ্ছে গভীরতর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করছি। যখন পরের চটিতে পৌঁছলাম আমরা, তখন দিব্যি অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে মাত্র আর একটি ছোট দল ছিল—যাত্রীরা উত্তর-মাদ্রাজ অঞ্চলের। সবাই তাড়াতাড়ি রাঁধবার খাবার ব্যবস্থায় লেগে গেল।

"অন্ধকারমগ্ন সেই যায়গাটা আর সেই রাত্রিটা আমার মনে একটা এমন ছাপ রেখেছে যা এ জন্মে মেটবার নয়। চটিটা একটা পাহাড়ের গোড়ায়, তার পেছনের দেয়ালটা পাহাড়েরই একটা অংশ। সেই দেয়ালটা একটু একটু ঢালের ওপর যে কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে কিছুই ঠাহর হয় না। চটির কলরব থেকে একটু আড়ালে এলেই একটা অদ্ভুত থম থমে ভাব। শব্দের রেশমাত্রও কোথাও কিছু নেই—অবস্থাটাকে যেন শুধু মৌনতা বললেই যথেষ্ট হয় না; মনে হয়—মৌনতাও যেন তার কাছে ঢের মুখর। সেই অন্ধকার, সেই রহস্যময় বন, সেই পাহাড়—যা কোথায় গিয়ে যে ঠেকেছে কেউই জানে না, আর, সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে সেই অদ্ভুত স্তব্ধতা—এই সব কটা একসঙ্গে আমার মনকে ভয়াট করে আমায় উল্লাসে, বিস্ময়ে যেন কি এক রকম করে দিলে মনের ভাবটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না—কেন-না মানুষ যখন একটা ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে তখন তার স্মৃতিশক্তিটা হয়ে পড়ে বড় অস্পষ্ট; তবে আবছায়াগোছের একটু মনে আছে যে হঠাৎ যেন একটা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার নেশা আমায় পেয়ে বসল—ঠিক আত্মহত্যা করবার নয় শুধু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার—এই তরল কষ্টিপাথরের মত অন্ধকারে, চির-অজ্ঞের

বনাশ্রিত এই পাহাড়ে, এই অপরূপ স্তব্ধতায়। বিরাট এক অজগর তার অপলক ঘনকৃষ্ণ চক্ষু দিয়ে আমায় সম্মোহিত ক'রে ফেলে তার অন্ধকার জঠরে আকর্ষণ করছে। সব তুচ্ছ ক'রে, সব ভুলে আমি স্থির পদক্ষেপে চলেছি, কেন-না গতির মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব মাদকতা।....আর একটা ঘূর্ণি উঠেছে, দেখ!"

অপেক্ষাকৃত ছোট ঘূর্ণি মিলাইয়া গেলে, সকলে আবার পূর্ববৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিল। শৈলেন বলিল, "খুব বেশি দূরে যাই নি, কেন-না একটু গিয়েই পদে পদে জঙ্গলের ডালপালায় বাধা পেয়ে আমার চৈতন্য হয়েছিল—এটা বেশ মনে আছে। ঠিক যেন আমার মনে হ'ল প্রাণপণে কে আমায় সামনে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছে—কার যেন নিঃশব্দ সতর্ক বাণী শুনতে পাচ্ছি—'এস না, এস না, এ পথ নয়,...।' ভরা চৈতন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সে ত আর সম্ভব নয়—সমস্ত রাত শুধু ঘুরে বেড়িয়েছি মাত্র। ভোরেও নয়, সকালেও নয়, যখন চটিতে ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। সঙ্গীরা—দুই দলেরই সবাই যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজি করে দুপুরের অল্প একটু আগে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বোধ হয় আরও থেকে যেত কিছুক্ষণ, কিন্তু এই সময় একজন তিব্বতী লামা চটিতে হঠাৎ এসে পড়েন। তিনি সব শুনে বললেন তিনিও পশুপতিনাথের পথেই যাচ্ছেন—আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।

"কথাগুলো শুনলাম আমার চটিওয়ালার কাছে। লোকটা তরাইয়ে এক সময় ছিল—ভাঙা ভাঙা গোছের এক রকম হিন্দী একটু একটু জানে, কাজ চালিয়ে নেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'লামা কোথায়?'

চটিওয়ালা একটা অন্ধকারগোছের ঘর দেখিয়ে বললে, 'তিনি ওইখানে বিশ্রাম করছেন।"

"বললাম, 'আমায় নিয়ে চল, অবশ্য যদি তাঁর আপত্তি না থাকে।"

"ঘরের মধ্যে গিয়ে কিন্তু দেখলাম কেউ নেই। বেরিয়ে বারান্দায় এসে চটিওয়ালা বললে, 'বাঃ, এই একটু আগে ত ঢুকলেন ঘরে।'

"বাইরে রোদটা খুব স্বচ্ছ, এদিকে ঘরটা কতকটা অন্ধকার, ধাঁধা লাগল না ত? সংশয়টা চটিওয়ালাকে জানাতে সে আবার ঘরে ঢুকল, আমিও পেছনে পেছনে গেলাম। অন্ধকার কোণটার পানে গলাটা একটু বাড়িয়ে চটিওয়ালা এবার একটা ডাকও দিলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম,—উত্তর এল আমাদের পেছন থেকে, ফিরে দেখি ঠিক দরজার বাইরে বারান্দায় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ আমাদের দিকে স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে দাঁড়িয়ে। চটিওয়ালা একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে কি একটা কথা বললে, তিনি তার উত্তরও দিলেন; চটিওয়ালা আবার কি একটা প্রশ্ন করলে, তারও উত্তর হ'ল; কিন্তু লক্ষ্য করলাম এবার স্বরটা একটু যেন রুক্ষ, দৃষ্টিতেও একটু যেন বিরক্তি—কারুর কথায় বিশ্বাস না করলে তার মুখের ভাবটা যেমন হয়, কতকটা সেই রকম। এবার চটিওয়ালার মুখে একটু খোশামোদের হাসি ফুটে উঠল, একটা কথাও কি বললে না-বুঝতে পারলেও মনে হ'ল একটা জবাবদিহি দিয়ে লোকটির বিরক্তিটা মিটিয়ে দিতে চায়। তার পর একটা প্রশ্ন করলে। তার উত্তরে লোকটা আমার পানে স্থিরভাবে সেকেণ্ড কয়েক চেয়ে থেকে ঠিক তিনটি শব্দে কি একটা কথা বললে। সমস্ত শরীরটি নিশ্চল শুধু চাপা ঠোঁট দুটি অল্পমাত্র একটু নড়ল।

"ঘরের মধ্যে সেই প্রথম না-পাওয়া থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টির সঙ্গে এই স্বল্পাক্ষর প্রশ্ন, আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। পূর্বেই বলেছি লোকটা বেশ দীর্ঘাকৃতি। মুখটা তিব্বতী ছাঁদেরই, তবে সাধারণত এদের মুখ যেমন ভাবলেশহীন হয় তেমন নয়—বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। মোঙ্গোলীয় জাতের বয়স নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে শক্ত, তবুও সমস্ত আকৃতিটার মধ্যে কোথায় যেন কি আছে যার দ্বারা একটা ধারণা আপনি থেকেই

বদ্ধমূল হয়ে যায় যে বয়সটার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব আছে—যেন আমাদের বয়সের মাপকাঠি দিয়ে মাপা চলে না—শতও হ'তে পারে দুই শত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, যদি তার ওপরেও কিছু হয় তা হলেও কিছু আশ্চর্য হবার নেই। আমাদের চেহারায় থাকে খণ্ডিত কালের নিশান, ওর চেহারায় কালের যদিই বা কিছু ছাপ লেগে থাকে ত সে অখণ্ড কালের।...সমস্ত মাথাটি মুণ্ডিত, গায়ে হলদে-রঙে ছোবান মোটা সিল্কের একটা তিব্বতী আলখাল্লা। লোকটা তিব্বতী নিশ্চয়, কিন্তু একটু বিস্মিত হয়ে দেখলাম বৌদ্ধ নয়, কেন-না হাতে একটি রুদ্রাক্ষের মালা ; তার মানে লামা নয়, বোধ হয় কোন মঠধারী শৈব। আমি একটু বিস্মিত হলাম এই জন্যে যে আমার ধারণা ছিল তিব্বতী মাত্রেই বৌদ্ধ।

"প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তির সঙ্গে মুখের পানে চেয়ে আছি, চটিওয়ালা বললে, 'বলছেন ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেরুবেন।'

"অদ্ভুত প্রস্তাব, যেখানে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় না খুঁজে বের করতে পারলে জীবনই বিপন্ন, সেখানে আশ্রয় ছাড়বারই ব্যবস্থা হ'ল সূর্যাস্তে! একটু হতভম্ব হয়ে লোকটির মুখের পানে চাইলাম ; প্রস্তরমূর্তিতে কোন পরিবর্তন না দেখে চটিওয়ালার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'বেশ, তাই হবে।'

"চলে আসতে আসতে চটিওয়ালা রুক্ষস্বরেই বললে, 'অথচ আমার যেন মনে হচ্ছে ঘর থেকে বেরুন নি, বাবু, কখন বেরুলেন? এই সব তিব্বতী লামার সব কিছু—'

"হঠাৎ পেছনের দিকে একবার চেয়ে চুপ ক'রে গেল।

"বুঝলাম নিশ্চয় এই রকম গোছের কোন মন্তব্য করতে তিব্বতীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, এবং ফিরে না দেখলেও মনে হ'ল সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে বলেই চটিওয়ালা হঠাৎ থেমে

গেল। অস্বীকার করব না, একটু যেন গা ছমছম করতে লাগল—লোকটার চেহারা অশ্রদ্ধা জাগায় না—মোটেই না, বরং বেশ একটা সম্ভ্রম জাগায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগায় অপরিমেয় রহস্যের ভাব। রাত্রিকে সামনে রেখে এই লোকের সঙ্গে পা বাড়াতে বেশ একটু গা ছমছম করতে লাগল; চটিওয়ালার অসমাপ্ত মন্তব্য সেটা আরও বাড়িয়ে দিলে।

"তার পর আবার এল সেই জোয়ার, সেই উগ্র কৌতূহলের জোয়ার। মনটা আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত উল্লাসে ভরে উঠতে লাগল। বুঝলাম আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, দূত এসেছেন আমায় নিয়ে যেতে।—রহস্য-লোকের যাত্রা ত সন্ধ্যার মাহেন্দ্র লগ্নেই; সামনে থাকবে দুরবিস্তৃত রাত্রি—অন্ধকার—অন্ধকার—আরও, আরও অন্ধকার তার পর যাত্রাপথের অসীম নিরাশা, অসীম ক্লান্তির শেষে আসবে প্রদোষ, তার সামনে দীপ্ত দিবালোক নিয়ে। দেখব আমি লোকাতীত এক নতুন জগৎকে, সেখানে বিস্মৃত অতীতের রহস্যলীলা মরণহীন কালের কোলে নিত্য লীলায়িত হচ্ছে। কোথা শঙ্কর?—কোথা উমা?—কোথা যক্ষ-গন্ধর্বলোকের সঙ্গে দেব-লোকের অপূর্ব মিলন? কোথা স্বর্গমর্তচারী দেবর্ষিদের জ্যোতিঃপথ-রেখা? দিব্যাঙ্গনাদের প্রমোদ ভূমি?—প্রত্যক্ষ করতে হবে। ভয়?—ভীরু যে, সে কি পাবে? যে বিপদকে আবাহন করতে পারলে না, মরণকে যে পরম ত্রাতা ব'লে আলিঙ্গন করে নিতে পারলে না, তাকে যে এই খর্ব, বিরস বৈচিত্র্যহীন জীবনকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে,—যে-জীবন হীনতর, দীর্ঘীকৃত মরণেরই নামান্তর মাত্র।—কী আনন্দ। আমি যাব। এই অগণিত যাত্রিদলের মধ্যে দেবতা আমায়ই বেছে নিয়েছেন এই মহাসৌভাগ্যের জন্যে! আমার ললাটেই তাঁর জয়টীকা দিয়েছেন পরিয়ে, আমারই জন্যে পাঠিয়েছেন তাঁর দূতকে! তাঁর অসীম করুণার জন্যে তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম। আমি যাব, যাব। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে থাকা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে ক্রমেই—"

শৈলেন ভাবের উন্মাদনার মধ্যে ভাষাকে একটা ঝংকার দিয়াই জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত সেই ভাবেই চুপ করিয়া রহিল—যে রহস্য-অভিযান এক দিন সত্য হইয়াছিল জীবনে, আজ হঠাৎ উদ্বেলিত স্মৃতিতে সেই অভিযান যেন রেখা-অনুরেখায় ফুটিয়া উঠিয়া এক অপ্রত্যক্ষ নূতনতর বাস্তবের রূপ ধরিয়াছে। এই আবেশের মধ্যে এরা তিন জনেও মৌন হইয়াই রহিল।

শৈলেন আবার আরম্ভ করিল—"চলার কথা আমি বিশেষ কিছুই বলব না, পথের বর্ণনারও চেষ্টা করব না। হিমালয়ের বর্ণনার জন্যে চাই কালিদাস—ঐ রকম এক উত্তুঙ্গ প্রতিভা। দিন নেই, রাত্রি নেই, চলেছি, আর প্রতি পদক্ষেপে পেয়েছি নতুন বিস্ময়। রাত্রির কথায় তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু সত্যিই আমরা রাত্রিতেও চলতাম পথ। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের নয়; আমরা যে ক্রমোচ্চ পথে চলছিলাম বেশি শাখাপ্রশাখার ঘন জঙ্গল তাতে ক্রমেই কমে আসছিল, মোটেই অলৌকিক নয়, নিতান্ত ভৌগোলিক ব্যাপার। আমরা যে স্তরে আরম্ভ করেছিলাম সেইটে ছিল ঘন বনের শেষ চিহ্ন, আমরা সেই রাত্রির প্রথম অংশেই সেটা অতিক্রম ক'রে গেলাম। আশ্চর্যের মধ্যে এইটুকু দেখলাম যে, যে পথে আমরা যাচ্ছিলাম সেটা রেড রোড্ না হ'লেও যে পথে এতক্ষণ চলেছি তার চেয়ে ঢের সহজ, ঢের পরিচ্ছন্ন। হ'তে পারে আমি একটা প্রবল আকর্ষণে ছোট ছোট সব বাধাকেই অগ্রাহ্য ক'রে চলেছি, তবু এ কথা মানতেই হয় যে খুব বেশি বাধা তেমন কিছুই ছিল না। আর একটা কথা যা তখন ভেবে দেখি নি, অথবা যা তখন, কেন জানি না, অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছিল, তা এই যে, সে-রাত্রে এবং পরে সব রাত্রেই বরাবর একটা অস্পষ্ট আলো পেয়ে গেছি। পরে মিলিয়ে দেখেছি, সে আলো—বা আলোর আভাস বলাই ঠিক—বেরিয়েছে সেই তিব্বতী সঙ্গীর দেহ থেকে! তোমরা আপত্তি করবে জানি, কিন্তু এটাও খুব একটা

অলৌকিক জিনিস নয়। কখনও কখনও মানুষের মধ্যে যে এ জিনিসটা পাওয়া যায়, বিজ্ঞান থেকে ধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত সব কিছুই এটা স্বীকার করে। বিজ্ঞান বলে এটা শরীরের মধ্যে কোন একটা রাসায়নিক দ্রব্যের আধিক্যের জন্যে হয়। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিজ্ঞান-ঘেঁষা বলে আপাতত থিয়োসফিকেই ধরা যাক—থিয়োসফি বলে, ও একটা তেজ বটে—তবে অলৌকিকের চেয়ে লৌকিকই বেশি। প্রয়োজন মত উৎকর্ষ করলে সবারই হ'তে পারে। কতকটা অন্ধকারের মধ্যে পূর্ণ দৃষ্টিশক্তির মত। এই আমার থিয়োরী; না হয়, সম্মোহনত মানই, ধরে নাও আমি সম্মোহিত হয়েই বরাবর একটি অস্পষ্ট আলোককে অনুসরণ ক'রে চলতাম। যাই হোক ব্যাপারটা হ'ত, আর আমার কাছে আগাগোড়াই এত সহজ ভাবে দেখা দিয়েছিল যে আমি কখন বিস্মিত হই নি, বা প্রশ্ন করি নি। এই সঙ্গে এটাও জানিয়ে রাখি যে হিমালয়গর্ভে পদে পদেই এত বিস্ময়, এত নূতনত্ব যে প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তিটা লুপ্ত হয়ে আসে।"

অশ্বিনী বলিল, "দু-একটা উদাহরণ ছাড়তে ছাড়তেই চল না।"

শৈলেন তাহার পানে চাহিয়া, ক্ষণমাত্র কি একটা ভাবিয়া লইয়া বলিল, "দাঁড়াও, কথাটা আমি একটু ভুল বলেছি। হিমালয়, হিমালয় হ'লেও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির মধ্যে যে সর্বদাই রহস্য আর বিস্ময় আছে এমন নয়, শুধু অপরূপত্ব আছে এইটুকু বলতে পারি। তবে আমি মাঝে মাঝে একটা অতিপ্রাকৃত জগতেরও পেয়েছিলাম সন্ধান।—তাই বা কেমন ক'রে বলি?—তখন চেষ্টা করি নি, মনের অবস্থা চেষ্টা করবার মত ছিল না, তাই বিস্মিতই হয়েছিলাম; পরে কার্য-কারণের সম্বন্ধ মিলিয়ে অনেক-গুলোরই যেন রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছি, অবশ্য অনেকগুলোর পারি নি এখনও, কিন্তু সেটা আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অল্পতার জন্যও ত হ'তে পারে। তা ভিন্ন এখনও পারি নি ব'লে যে ভবিষ্যতেও কখনও পারব না, তাই বা কেমন ক'রে মেনে নিই?"

অক্ষয় একটু তর্কের ঝাঁজের সঙ্গে প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে বলতে চাও যে অলৌকিক ব'লে নেই কিছু এত বড় সৃষ্টিটার মধ্যে ?"

শৈলেন একটু মাথা নীচু করিয়া চিন্তা করিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল তারাপদ বলিল, "এ সব পরে হবে, আগে গল্পটাই শেষ কর।"

শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম,—যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই আমি একবার পশুপতিনাথের কথা তুলেছিলাম। তাতে লোকটা ভ্রূভঙ্গি ক'রে আমায় কি একটা প্রশ্ন করলে। তার অর্থ যাই হোক, আমার যেন মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করলে সত্যই কি আমি সেইখানেই যেতে চাই ? হয়ত অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করে থাকবে, কিন্তু আমার চিন্তার গতির জন্যেই এই মানেটা ক'রে আর আমি কিছু বলতে সাহস করলাম না। যে দিকে যাচ্ছিলাম সেইদিকেই হাতটা বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলাম—আমি ওর পথেই চলব। মনে হ'ল ও যখন মনের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে তখন প্রবঞ্চনার চেষ্টা করা কেন ? তারপর চলেছি, কত দিন যে চলেছি, প্রথম প্রথম হিসেব রাখলেও কয়েক দিন পর থেকে আর রাখতে পারি নি, চেষ্টাও করি নি বোধ হয়। দিনের পর রাত এসেছে, রাতের পর দিন ; আমরা চলেছি, এমন একটা ব্যস্ত অধীরতার সঙ্গে যেন বিশেষ কোথাও একটা পৌঁছতে সামান্য বিলম্ব হয়ে গেলে আমাদের সমস্ত যাত্রাটাই মাটি হয়ে যাবে। উৎকট ঔৎসুক্যের জন্যেই হোক বা যে-জন্যেই হোক এক একবার মনে হ'ত খুব সুদূরের বাঁশির অতি ক্ষীণ সুরের মত কি একটা কানে এসেই মিলিয়ে গেল, কিংবা অতি দূরের একটা গন্ধের রেশ,—যেন এই তরঙ্গায়িত, শ্রেণীর পর শ্রেণীবদ্ধ গিরিস্তূপের কোন্ সুদূর প্রান্তে একটা মহোৎসবের আয়োজন হচ্ছে—তারই আসরে সুর বাঁধার এই ছিন্ন সংগীত ; তারই জন্য সুগন্ধি সমাবেশের এই খণ্ডিত আভাস। কত উপত্যকা, কত অধিত্যকা পেরিয়ে, পর্ব্বতের

চূড়ার পর চূড়া ডিঙিয়ে আমরা চলেছি। খর্ব এক রকম ঘাসের স্তর পেরিয়ে ঝাউয়ের স্তরে পড়লাম, সেটা পেরিয়ে প্রথম তুষারের দেশে সবুজ মখমলের মত এক রকম উদ্ভিদ, মাঝে মাঝে নেমে আবার পরিচিত অপরিচিত উদ্ভিদের স্তরে—রাঁধার হাঙ্গামা নেই, আহার মাত্র ফল-মূল, কখনও কখনও কোন লতাপাতার রস। সবগুলোই যে সুস্বাদ তা নয়, তবে সবগুলো থেকেই যে শক্তি পেয়েছি এ কথা অস্বীকার করতে পারি না। বিশ্রাম করতে পেরেছি অতি অল্পই, একটানা তিন ঘণ্টার বেশি কখনও নিদ্রা দিতে পেরেছি ব'লে মনে হয় না—অবশ্য সূর্য বা চন্দ্র যতটুকু দেখতে পেতাম তারই আন্দাজে বলছি; কিন্তু কখনও ক্লান্ত হই নি। শেষে আমরা একদিন আমাদের পথের উচ্চতম জায়গাটিতে একটা ঘন বরফের অধিত্যকায় এসে পৌছলাম, তারপর শুধুই নামতে আরম্ভ করলাম। আবার সেই সবুজ মখমলের মত উদ্ভিদ, তার পর ঝাউ, তার পর বেঁটে খড়ের বন, কিন্তু তার পর যখন অনেক রকম গাছের সংস্থানে ঘন জঙ্গল আশা কর্‌ছি তখন এক দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়লাম অত্যন্ত একটা রুক্ষ দেশে—না আছে একটি জলের ধারা, না আছে একটি সবুজের রেখা, যেন একটা প্রকাণ্ড পোড়া মাটির নরম তাল সমস্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে ওপর থেকে নামতে নামতে কয়েকটা ঢেউ তুলেই হঠাৎ কঠিন হয়ে গেছে। এইখানে এসে আমাদের যাত্রা শেষ হয়ে গেল।

শৈলেন চুপ করিয়া বালিসে এলাইয়া পড়িল। তারাপদ সিগারেট খাইতেছিল, হাতটা বাড়াইয়া বলিল, "এবার দাও।"

তিনজনেই প্রবল আপত্তি করিয়া উঠিল। অক্ষয় বলিল, "বাঃ, শেষ হয়ে গেল! এত দূর বন, জঙ্গল, নদী, বরফ পার করিয়ে এনে তুমি আমাদের এই আঘাটায় তুলে ছেড়ে দেবে নাকি?....আর কিছু না হোক মনগড়াও একটা বিস্ময়ের নমুনা...."

শৈলেন সিগারেটের ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "প্রথম বিস্ময় হ'ল, এই রুক্ষ প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে এক সময় দৃষ্টিটা কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেখি আমি সঙ্গিহীন।"

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য!—সে কি!"

শৈলেন বলিল, "অবস্থাগতিকে বোধ হয় স্মৃতিবিভ্রম ঘটে থাকবে তাই আমার যা তখন সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়েছিল তা এই যে আমি কি ক'রে ভাবলাম যে আমার একজন সঙ্গী ছিল? ছিল না ত কেউ। গভীর নিদ্রায় পর ক্লান্তির মত আমার সমস্ত শরীর মন থেকে যাত্রাপথের যা কিছু সবই যেন মুছে গিয়ে খুব অস্পষ্ট একটা স্মৃতিমাত্র অবশেষ রইল। মনে স্পষ্ট শুধু এই রইল যে, আমি এখানে রয়েছি। ভয়ের বদলে একটা পুলক-রোমাঞ্চ আমার শরীরে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে আমায় কোন্ এক ঊর্দ্ধলোকে যেন তুলে ধরলে। বেশ বুঝলাম এইবার পট উঠবে। সেই সুরের তরঙ্গ, সেই শত পুষ্পসারের গন্ধ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের উৎসের সন্ধানে আমি সব শক্তিকে নিয়োগ ক'রে দিলাম। জোৎস্না-পক্ষ অনেক দিন থেকেই চলছিল, সেই শুকনো মাটির ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে আমি এগিয়ে চললাম, এইটুকু জ্ঞান আছে ক্রমাগত নেমেই চলেছি, তার পর আকাশে স্বচ্ছ চাঁদ যখন প্রায় পশ্চিমে হেলে পড়েছে সেই সময় মনে হ'ল বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পথ-চলার যত ক্লান্তি যেন আমার ঘাড়ে একসঙ্গে চেপে এল; একটা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, সেইখানেই অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়লাম।

"জানি না তার পরের দিনের কথা, কি—আরও দু-দিন পরের কথা—যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখলাম পূর্ব দিকে প্রথম উষার অস্পষ্ট আলো দেখা দিয়েছে। সেই ক্ষীণ আলোতেই সামনে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে, আনন্দে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কেন্দ্র থেকে চারি দিকে প্রায় চার-পাঁচ মাইলের দূরত্ব নিয়ে একটা বিশাল উপত্যকা। চারি দিকে

পাহাড় ধাপের পর ধাপে উঠে গেছে—গোড়ায় ঘন জঙ্গলের আবরণে নীল, তারপর সেই নীল স্তরে স্তরে ফিকে হ'তে হ'তে শেষ রেখায় গিয়ে বরফের রূপালিতে মিলিয়ে গেছে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সেই রূপালির গায়ে সোনার জলের প্রলেপ পড়ল, নীচের তরাইও অমনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তারপর চোখের সামনে যা একে একে ফুটে উঠতে লাগল তাকে দৃশ্য বলব, কি কাব্য বলব বুঝে উঠতে পারছি না। কাব্যই—উদীয়মান সূর্যের এক এক ঝলক কিরণে সেই সেই কাব্যের এক-একটা পাতা যেন আমার চোখের সামনে উল্টে যেতে লাগল। একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে অত বিচিত্র রঙের সমারোহ আমি জীবনে কখনও দেখি নি। কত ফুল—রাঙা, হলদে, শাদা, নীল, বেগুনে—রঙের আর ইয়ত্তা নেই. স্তবকের পর স্তবক চলেছে ত চলেছেই। দূরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার সূর্যের বর্ধমান তেজ সেগুলোকে জাগিয়ে তুলছে। কত বিচিত্র লতাগুল্ম, গাছপালা—তাদের সবুজটা গাঢ় আর ফিকে রঙের উঁচু-নীচু পর্দায় যেন একটা অপূর্ব সংগীতের সৃষ্টি করেছে।···ভোরের প্রথম দিকেই এক সময় তরাইয়ের সুপ্তি চকিত ক'রে কোথায় একটি মাত্র পাখীর কণ্ঠস্বর উঠল। ঠিক যেন মনে হ'ল মূল গায়েন গানের প্রথম কলিটা ধরিয়ে দিলে, তার পর এক সঙ্গেই উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত কোণকান থেকে হাজার হাজার পাখীর কাকলি সমস্ত তরাই সুরে সুরে ভরাট ক'রে দিয়ে পাহাড়ের অলিগলি বেয়ে বাইরে ছুটে চলল। একটা হাওয়া উঠেছিল, পাখীদের এই সমতানকে দুলিয়ে খেলিয়ে, গাছে গাছে রঙের ঢেউ তুলে, একটা অদৃশ্য স্রোতের মত পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগল। সবার ওপর সেই মিষ্ট গন্ধ—অপূর্ব, কল্পনা করা যায় না যে একই বায়ুস্তরে একই সময়ে এত বিচিত্র গন্ধ ঠাসাঠাসি ক'রে থাকতে পারে, সবুজটাকে সুর বলেছি, এ যেন আরও সূক্ষ্মতর এক সংগীত।····বিস্ময়ের মধ্যেই একবার মনে

পড়ল, যতদিন চলেছি তাতে তো এটা ভরা বসন্তই হওয়া উচিত, ফাল্গুনের শেষ, কি চৈত্রের আরম্ভ; কিন্তু যত বসন্ত কি হিমালয়ের এই একটি তরাইয়ের মধ্যে গাদাগাদি ক'রে আসতে হয়! আর এ কি হিমালয়? নগরাজের সে পৌরুষ গাম্ভীর্য কোথায়? এতটা পথ এলাম, এ হাল্কা রূপ ত কোথাও দেখি নি—এ যেন এক সুরনর্তকী তার হাস্যে লাস্যে, সাজসজ্জায়, বিলাস-বিভ্রমে ধ্যানমগ্ন যোগিবরের....

"বেশ মনে পড়ে, যখন চিন্তার ঠিক এই জায়গাটিতে, আমার দৃষ্টি হঠাৎ সামনের একটা দৃশ্যের ওপর আটকে গিয়ে আমি নিশ্চল, স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"বহুদূরে তরাইয়ের পশ্চিম দিকে উঁচু একটা চাতালের ওপর পূর্বাস্য হয়ে ধ্যানরত এক বিরাট মূর্তি; তাঁর পদ্মাসনবদ্ধ উন্নত শরীরের ওপরের দিকটা আচ্ছন্ন ক'রে দীর্ঘ জটাভার, বায়ুচালিত লতার মতই ফণীর দল তাঁর বিরাট শরীরের ওপর মসৃণ গতিতে চলে বেড়াচ্ছে; এক এক সময় যেন শত শত ক্রুদ্ধ ফণায় উচ্ছ্বসিত,—সূর্যের কিরণে সমস্ত দেহ উজ্জ্বল শ্বেতাভ—এমন ভাবে কিরণ-পুঞ্জ এসে পড়েছে যে একটু বেশিক্ষণ দৃষ্টিটাকে ধরে রাখলেই মনে হয় যেন ধাঁধা লেগে গেল।

"আমি এক মুহূর্তেই বুঝে গেলাম ব্যাপারটা কি। আমার সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেল। তার পরে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা যে চৈতন্যের কোন্ স্তরের তা আমি ঠিক ক'রে বলতে পারি না। আমার দু-দিন থেকে উপোস যাচ্ছিল,—এক পাতার রস খাওয়া ছাড়া, সেই সমস্ত দিনটাও কিছু খাইনি। শুধু বসে বসে অপলক নেত্রে দেখে গেছি—জেগে কি তন্দ্রায়, কি গাঢ় ঘুমের স্বপ্নে, কি মনের আরও গভীরতম কোন অজ্ঞাত চেতনার স্তরে, কিছুই বলতে পারব না। শুধু দেখলাম দিন আর একটু অগ্রসর হ'তে নটরাজের নাট্যশালার আর একটা পট উঠল। সেই বসন্ত যার কাছাকাছিও কিছু

একটা কেউ পৃথিবীতে কখনও দেখে নি, সেটা রূপে, শব্দে, গন্ধে আরও যেন শতগুণ মদির হয়ে উঠল। ক্রমে নেশার মত একটা অনুভূতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ ক'রে ফেলতে লাগল—মনে হ'তে লাগল এই বসন্তই সত্য আর সব কিছু মিথ্যা—মনের শত নিষ্ঠা দিয়ে জীবনে যা-কিছু অর্জন করেছি সবই যেন অক্লেশে ফাগুনের এই জ্বলন্ত শিখায় আহুতি দেওয়া যায়। সব সাধনার সব তপস্যার—সেই যেন চরম সার্থকতা। চিন্তার মধ্যেই আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। পূবের পাহাড়ের সোনা-রূপার ওপর দিয়ে সূর্য্যের যে কিরণ এসে পড়ছিল সেইগুলোই বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হওয়ার জন্যেই হোক বা আমার দৃষ্টিবিভ্রম হোক, অথবা দুটোর মিলিত পরিণতিই হোক, এক সময় মনে হ'ল উর্দ্ধে কোথা থেকে আলোর পথ বেয়ে কারা সব নেমে এসে সেই তপস্যা-বেদীর চারি দিকটা ফেললে ঘিরে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল তাদের বিলাসোচ্ছল নৃত্য। যা ছিল পাখীদের কাকলি মাত্র, সুরে সুরে ঘনীভূত হ'য়ে তারই একটা অংশ যেন এক অপার্থিব সংগীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আয়োজনের এই পূর্ণতার মধ্যেও কোথায় একটা কি অভাবের সুর ঘনিয়ে উঠতে লাগল,—একটা অব্যক্ত যাতনা, একটা চাপা হাহাকার। বহুক্ষণ ধরে চলল, আমারও মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণি জেগে উঠছে। দিন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, আলো উজ্জ্বলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙের রাশি হয়ে উঠছে আরও তীক্ষ্ণ,—যেন তরাইয়ের শেষ পুষ্পকলিটি পর্যন্ত কিসের তাড়ায় তাড়াতাড়ি ফুটে উঠছে, সংগীত হয়ে উঠছে আরও উচ্ছল হাওয়া মদিরতায় আরও বিহ্বল,—বেশ বুঝা যাচ্ছে সবগুলোই একটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে মত্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে,—লয় ক্রমশই দ্রুত করতে করতে সংগীত যেমন শেষতম সমের পানে ছুটে চলে।

তারপর দুপুরের একটু পরেই এই রহস্যময় মাদকতা যখন শেষ

সীমায়, হঠাৎ যোগীর ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সব গেল বদলে, বাতাসের গতিটা পর্যন্ত। এতক্ষণ ছিল দক্ষিণপ্রবাহী, হঠাৎ মূর্তির পেছন থেকে গিরিসঙ্কট বেয়ে আগুনের হলকার মত একটা বায়ুস্রোত ঢুকে পড়ল। একটা বিকট ঝম্-ঝম্-ঝম্ শব্দ, তার পরেই সেকেণ্ড-কয়েকের জন্যে সমস্ত তরাইটা স্তব্ধ হয়ে গেল, সব যেন একটা উৎকট ভয়ে আঁৎকে উঠেছে। এর পরেই যা আরম্ভ হ'ল তাকে মদনভস্মের পুনরভিনয় ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। প্রথমেই সেই মূর্তিটা মাথার জটা ফুলিয়ে, গায়ের আভরণ ফণিদলকে ত্রস্ত ক'রে, উগ্র দৃষ্টিতে জেগে উঠল। আর, শুধু এক দক্ষিণ দিক ছাড়া সব দিক দিয়েই সেই রকম আগুনের হলকার মত হাওয়ার স্রোত ঢুকতে লাগল—পাহাড়ের অলি-গলি যেখানেই একটু পথ পেলে সেখান দিয়েই। ক্রমে চারি দিককার হাওয়ার সংঘর্ষে, তাণ্ডব নাচে ভূতনাথের সঙ্গিদলের মতই, ঘূর্ণির পর ঘূর্ণি। সেও নিশ্চয় এই চৈতালী ঘূর্ণিই, কেন-না, আগেই বলেছি আমি যা দেখেছিলাম সেটা ফাল্গুন-শেষের বা চৈত্র-আরম্ভের ব্যাপার ;—চৈতালী ঘূর্ণিই, কিন্তু তার কাছে এ ঘূর্ণি শিশুমাত্র! গাছ উপড়ে, ফুলে-ভরা গাছের ডালগুলোকে লুফতে লুফতে প্রলয় হুংকারে সমস্ত তরাইটা ওলটপালট ক'রে ফিরতে লাগল। ধুলোয় ধুলোয় দিগন্ত হয়ে এল অন্ধকার, ডাল-পাতার সংঘর্ষে পাহাড়ের কোলে দাবাগ্নি জ্বলে উঠে সেই ধুলোকে গৈরিকে রাঙিয়ে আগুনের মতই উত্তপ্ত ক'রে তুললে। সূর্যও হয়ে উঠল প্রলয়ের সূর্যের মতই প্রখর। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা সেই প্রকাণ্ড তরাইয়ের গহ্বরে একটা চাপা হুংকার গর্জে ফিরতে লাগল—সংহার—সংহার—শুধুই সংহার,—তার সঙ্গে মিশল ধ্বংসের হুতাশ, মৃত্যুর আর্তনাদ ;—একটা দিন যার প্রভাত ছিল এত অপরূপ সুন্দর, অপরাহ্ণে সেটা অকস্মাৎ এত বিকট হয়ে উঠতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

"ক্রমে ঘূর্ণির ধুলো-বালির সঙ্গে পোড়া জঙ্গলের ছাই মিশে তরাইটাকে

লুপ্ত করে সূর্যকে নিষ্প্রভ ক'রে আনলে। মাতুনি আরও বেড়েই চলল। ঘূর্ণিতে গাছের জলন্ত শাখা ঘোরাতে ঘোরাতে ধ্বংসের অট্টহাসের সঙ্গে চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে ঘুরতে লাগল, মাঝে মাঝে দৃশ্য আরও বীভৎস —শূন্যে জলন্ত শাখার সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের শাখার জড়াজড়ি—চাপা আর্তনাদের সঙ্গে ফুলের স্তবক দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে মুহূর্তে এক মুঠো ছাই হ'য়ে ধুঁয়ায়-ভরা আকাশে মিলিয়ে গেল। বিনষ্টতপা শঙ্করের তৃতীয় নয়নের আগুন পঞ্চশরের শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত ভস্মীভূত না করে তৃপ্ত হবে না।

"কখন সূর্যাস্ত হ'ল বোঝা গেল না, ধুলো আর ধুঁয়ার সঙ্গে কখন যে মেঘ এসে মিশে গেছল তাও টের পাই নি। এক সময় বৃষ্টি নামল—বোধ হয় সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই।"

শৈলেন চুপ করিল। আর তিন জনেও খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল; তাহার পর অক্ষয় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "আশ্চর্য!"

শৈলেম বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল. তাহার পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কোনটে?"

অক্ষয় উত্তর করিল, "কোন্‌টে নয়?—সেই মঠধারী;—তার আবির্ভাব, তিরোভাব দুই-ই; সেই ধ্যানমগ্ন বিরাট মূর্তি, যা শেষে অমন ক'রে প্রলয়ে মেতে উঠল…"

অশ্বিনী কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "এমন কি সেই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও তোমার অক্ষত থাকাটা পর্যন্ত…."

শৈলেন বলিল, "তোমরা যে অর্থে আশ্চর্য বলছ তার কিছুই নয়, তবে অসাধারণ বটে, বিশেষ ক'রে সমতলবাসী বাঙালীর দৃষ্টিতে।….রাতটা আমি সেইখানেই কাটালাম—আশ্রয় খোঁজাখুঁজি করবার ইচ্ছা বা উৎসাহ কিছুই ছিল না। সকালে পিছন দিকের একটা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে নেমে

যখন তরাইয়ের কোলে এলাম, দেখি রং-বেরঙের কাপড়পরা স্ত্রী-পুরুষের দল তরাই ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। এক নূতনতর কৌতূহলে নিজকে পাহাড়ের আড়ালে রেখে রেখে আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম অধিকাংশ সব যুবক আর যুবতী, ক্বচিৎ এক-আধটা প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নেই—একটু তিব্বতীঘেঁষা চেহারা হ'লেও সব অপূর্ব সুন্দর। আর দেখলাম সকলে সেই মহাশ্মশানের এক-এক মুঠো ছাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।···

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "ছাই!"

শৈলেন বলিল, "ছাই!···বুঝতে পারছ না? আমাদের দেশের দোল-পর্বের ঠিক বিপরীত একটা পর্ব, একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান!—যে মদন নিত্যই যুব-হৃদয়ে পঞ্চশরের আগুন জ্বালছে, তার বিরুদ্ধে শঙ্করের রোষাগ্নিপূত রক্ষা-কবচ।

"তরাইয়ের সবাই অক্ষত দেখে আমি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। দেখি এই বিরাট নাট্যশালার একটা অডিটোরিয়াম বা প্রেক্ষাগৃহ আছে। প্রেক্ষাপ্রাঙ্গণ বললে আরও ঠিক হয়। তার অসাধারণত্ব এইখানে যে সেটা কলকাতা বা অন্য কোন জায়গার একটা অসাধারণ অডিটোরিয়ামেরই মতন। রুক্ষ, কঠিন-হয়ে-যাওয়া গলা পাথরের পাহাড়টা সিঁড়ির মত থাকে থাকে ওপর দিকে উঠে গেছে, মাঝে মাঝে কতকটা ব্যালকনির মতনই এক একটা অংশ সামনের দিকে ঠেলে এসেছে। তার ওপর থাকলে নিচের ধাপগুলো চোখের আড়ালে পড়ে যায়। বুঝলাম আমি খুব উঁচুতে এই রকম একটা ব্যালকনিতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আমার বা আমাদের গায়ে যে আঁচড় লাগে নি তার কারণ আগেই বলেছি—ঘূর্ণিগুলো এই এক দক্ষিণ দিকটা ছেড়ে আর সব দিক দিয়েই এসেছিল—স্বভাবতই ধ্বংসলীলাটাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই দিকটা বাদ দিয়েই। সেটার মধ্যে আশ্চর্য কথা ত দূরে থাক,

অসাধারণত্বেরও কিছু নেই—নিতান্ত ভৌগোলিক ব্যাপার—হিমালয় এবং তিব্বতের সংস্থান আর আদিম ইতিহাসটা জানলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে; একটু পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি! এখন শুধু জেনে রাখ যে আমি যেখানটায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেটা হিমালয়ের শেষপ্রান্ত।

"এবার তোমার দ্বিতীয় আশ্চর্যের কথা। তয়াই যাত্রিশূন্য হ'লে আমি সেই মূর্তির দিকে এগুতে আরম্ভ করলাম।...."

অক্ষয় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "মূর্তি ছিল তখনও ?"

শৈলেন উত্তর করিল, "প্রায় দেখা যায় পাহাড়ের গা থেকে একটা অংশ ঠেলে এসে একটা জীব, জন্তু বা মানুষের আকারে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। কত যুগ ধরে উত্তরায়ণের সঙ্গে তিব্বতের হাওয়া তেতে উঠতে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়ে এসেছে, সেই সব ঘূর্ণি বালির উকো দিয়ে এই রকম একটা ঠেলে আসা পাথরের গায়ে খাঁজখোঁজ তৈয়ের করে একটা আসনবদ্ধ মানুষের মূর্তি সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। পাহাড় অঞ্চলে খুবই সাধারণ একটা দৃশ্য—বিশেষ যেখানে ঝড়ের প্রাবল্য আছে! সমস্ত বৎসর ধরে এই মূর্তির কোণকানে বিচিত্র রঙের লতাপাতা জন্মে' সমস্ত মূর্তিটাকে...."

অক্ষয় একটু নিরাশ হইয়াই বলিল, "এই পর্যন্ত থাক্।"

তারাপদ, এমন কি অশ্বিনীর মত অবিশ্বাসীও এই বিরতিতে আপত্তি করিল না। তিন জনেই বাইরের তপ্ত প্রকৃতির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যেন অন্তরে যে সুরের প্রবাহ, তাহাকে নষ্ট না হইতে দিয়া বাইরে তাহার সংগত খুঁজিতেছে।

শুধু শৈলেনের মুখেই একটা মৃদুহাস্যের জের কোথায় যেন লাগিয়া রহিল।

[১৩৫০]

খোকা

[১]

খোকাকে আপনাদের মনে থাকিতে পারে, কিছু পূর্বে তাহাকে গৃহদেবতা গোপালের জন্য সঞ্চিত ক্ষীর চুরি করিতে দেখা গিয়াছিল। ছেলেটি এখন আরও একটু বড় হইয়াছে। এখন তাহার মায়ের কোলে তাহার সেই সময়কার বয়সের একটি বোন।

খোকার ধারণা অবশ্য—একটু নয়, সে খুব বড় হইয়াছে—এত বড় যে কত বড় সে নিজেই ঠিক মত ধারণা করিতে পারে না। আন্দাজটা পাকা করিবার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। এ-বিষয়ে তাহার সহায়িকা খুকী। অমন লক্ষ্মী সহায়িকা থাকিলে পরীক্ষার সুবিধাও অনেক। খোকা যখন পাশের বাড়ির গৃহশিক্ষক নিবারণ পণ্ডিত হইয়া বসে, খুকী পাশের বাড়ীর মন্টুর চেয়েও বেশি দুলিয়া পড়া করিতে থাকে। দোলন একটু কমিলে নিবারণ পণ্ডিতের মতই খোকা গম্ভীর ভাবে বলে, "খুকু তোমার বাবাকেও পড়িয়েছি, তোমাকেও পড়াচ্ছি—আমার কাছে ফাঁকি চলবে না! পড়।....তুমি এইবার এই রকম করে বল—'বাবাকেও পড়িয়েছেন মাস্টার-মশাই?—ওরে ব্বাবা'!"

খুকু অতটা পারে না, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করে, বলে, "পলেছিলে মছাই? ওলে ব্বাবা!"

খোকা চোখ পাকাইয়া হাত দোলাইয়া বলে, "হু! এই হাতে কত কানমলা খেয়েছে, জিগ্যেস ক'রো না তোমার বাবাকে!....এইবার তুমি আবার এই রকম করে চেয়ে বল—'ওরে ব্বাবা'!"....

বড়য় রূপান্তরিত হওয়া ব্যতীত খোকা এক এক সময় নিজেই বড় হইয়া গিয়া বড় বড় কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়—বাবার জুতা



খোকা চোখ পাকাইয়া হাত দোলাইয়া বলে······

পরিয়া, কি কাকার মোটা ডাক্তারী বই লইয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে, তাহার পর হঠাৎ খেয়াল বদলাইয়া আসল বয়সের খেলার ঝোঁকে বই, জুতা কোথায় থাকে পড়িয়া—যথাস্থানে যথাসময়ে সেগুলার

খোঁজ পড়ে—খোকার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে কাকার কিল, বাবার চাপড়, মায়ের গঞ্জনা।

পূজার সময় খোকাকে এখন আর ক্ষীর চুরি করিতে দেখা যায় না। নৈবেদ্য উৎসর্গের সময়টিতে খুকীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কাছটিতে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; বড়র উপযোগী সব উপদেশ দিতে থাকে, "খুকু, তুমি ওটা খাবো মনে করছ নাকি? করতে নেই। নোলায় খবরদার জল আসতে নেই খুকুমণি—ঠাকুর তাহ'লে…"

নিজের নোলা জলে অচল হইয়া পড়ায় বোধ হয় থামিয়া যাইতে হয়।

খুকীর লোভটা অন্যত্র, রসনা আশ্রয় করিয়া ততটা নয়। রংচঙে কাপড়চোপড়-জড়ান মূর্তিটির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে, "ঠাকুল নোব।"

এবার খোকা একেবারে অকৃত্রিম ভাবে বড় হইয়া পড়ে। খুকীর মুখটা খপ করিয়া চাপিয়া ধরে এবং যাহাতে এত বড় অনুচ্চরণীয় কথাটা ঠাকুরমা বা ঠাকুরের কানে না যায় সেই জন্য খুকীর একেবারে মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া খুব চাপা গলায় বলে, "বলতে নেই খুকু, চুপ কর।"

এমন ভীষণ অন্যায়টা খুকী যাহাতে আবার না করিয়া বসে সেই জন্য তাহার মুখটা চাপিয়া বসিয়া থাকে এবং ঠাকুরমার পূজা সাঙ্গ হইলেই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া ওঠে, "খুকুর কথা শোন ঠাকুরমা, বলছিল ঠাকুর নেবে! ঠাকুরকে পুতুল ভেবেছে! এবার ঠাকুর ওকে কি করবেন?"

ঠাকুরমা চারিটি মুঠা ক্ষীরে কলায় ভরিয়া দিতে দিতে হাসিয়া বলেন, "কিছু করবেন না এবারটি, আমি বলে দেব'খন।"

খোকা করুণাময় মুখ-চোখ কুঞ্চিত করিয়া ঠাকুরমার পানে চাহিয়া বলে, "হ্যাঁ ঠাকুরমা, বলে দাও; কচি মেয়ে বলে ফেলেছে একটা কথা—ওর তো জ্ঞান হয় নি এখনও তত।"...

ঠাকুরমার সঙ্গে কথাবার্তায় ঠাকুর যদি তাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, সেই জন্য খোকা আগে থাকিতেই সাবধান হইয়া প্রশ্ন করে, "আমি কখন বলেছি ঠাকুমা?"

[২]

না, খোকা বলিবে কি করিয়া? তাহার পক্ষে তো বলা সম্ভবই নয়। সে যদি খুকুর মত না জানিত তবে তো বলিত? সে যে জানে ওটা পুতুল নয়, গোপাল। অবশ্য গোপালকে ঠাকুর ভাবিতে ওর এক এক সময় কি রকম মনে হয়—মনকে ভয় দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া মনে করাইতে হয়; কিন্তু ওটা যে রথযাত্রার পাঁচুর মার দোকানের পুতুল নয়, এটা খোকা ঠিক জানে। এটা যে গোপাল তাহার একটা মস্ত বড় প্রমাণ এই যে, দিনমানে এটা পুতুল হইয়া থাকে। এই যে লুকোচুরি এইটিই গোপালের পরিচয়—গোপালের স্বরূপ। এ-পরিচয় খোকার জানা আছে—অবশ্য কথাটা খোকা আর গোপালের মধ্যে একটা গোপন রহস্য।...ঠাকুরমা রাত্রে বৃন্দাবনের গল্প করিতে করিতে যখন ঘুমাইয়া পড়েন তখন হইতে আরম্ভ হয় গোপালের লুকোচুরির এই খেলা। আরম্ভটা খোকা ঠিক ধরিতে পারে না। খুব চেষ্টা করে তবে এখন পর্য্যন্ত পারে নাই ধরিতে।

গল্প বলিতে বলিতে ঠাকুরমা ঘুমাইয়া পড়িলে গোপাল আসিয়া তাহার খুব নরম হাতে খোকার চক্ষু দুইটি টিপিয়া ধরে—নিশ্চয় এই গোপালই, কিন্তু কেমন করিয়া ওর পাথরের হাত অমন ঘুমের মত নরম হইয়া যায় খোকা ঠিক বুঝিতে পারে না। গোপাল যখন

ছাড়িয়া দেয় চোখ, তখন খোকা দেখে সে একেবারে তাহাদের খেলার জায়গায়—বিছানায় তাহার ঠাকুরমার পাশে আর শুইয়া নাই। সেখানে তালপুকুরের মত কালো-জলে-ভরা যমুনার ধারে কদমগাছের আড়ালে আড়ালে তাহাদের লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে। তাহাদের বাড়ীর মুংলীর মত অনেক গরু, বুধীর মত অনেক বাছুর—তাহাদের হাম্বারবের সঙ্গে, গোপালের বাঁশির শব্দ আর—খেলায়-ভরা যমুনার তীরে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে। ঠাকুরমা যে গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়েন সব সেই রকম—সুদাম আছে, শ্রীদাম আছে, বলাই আছে, সুবল আছে—আরও কত সব আছে। গোপাল সকালে ঠাকুরমার কাছে পূজায়-পাওয়া ক্ষীর সর বিলি করে—যতই বিলি করে, ফুরায় না। কি করিয়া যে ফুরায় না খোকা এক এক দিন জিজ্ঞাসা করে।

ঘরের মধ্যে পূজার সময় গোপালের দিকে চাহিতে ভয় করে বটে, কেন না, গোপাল একদৃষ্টে ঠাকুরমার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে; কিন্তু যমুনার তীরে খেলার সময় গোপালকে তো মোটেই ভয় করে না—তাহা হইলে তো ওদের নন্তকেও ভয় করিত। না, পূজার গোপাল যখন খেলার গোপাল হইয়া যায় তখন করে না ভয়, তাই খোকা করে জিজ্ঞাসা এক এক দিন, বলে, "তুমি এত ক্ষীর সর পাও কোথায়? ঠাকুমা তো তোমায় একটুখানি করে দেন।"

গোপাল বলে, "পৃথিবীতে যত মা আর ঠাকুমা যত ক্ষীর সর লুকিয়ে রাখে আমি সব খুঁজে নিয়ে আসতে পারি!" যত ছেলেরা খেলে সবাই দুষ্টামির হাসি হাসিতে থাকে। খোকা চোখ বড় বড় করিয়া গোপালের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু কথাটা খোকার একটুও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, কেন না, ঠাকুরমাও তো খোকাকে এই কথা বলিয়াছে কয়েক বার। খোকা জিজ্ঞাসা করে, "তারা কেউ কিছু বলে না তোমায়?"

ঘরের ঠাকুরের হাতে যেখানটায় বালা পরান আছে, যমুনাতীরের গোপাল সেইখানটা খোকার সামনে বাড়াইয়া ধরিয়া বলে, "এই দেখ না দাগ, মা বেঁধেছিল"...খোকা দেখে একটুও মিছে কথা নয়, কড়া-বাঁধা রাঙা দাগে হাতটা ফুলিয়া গিয়াছে....আবার লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে—অবাধ খেলা—কাহারই বাবা, কি কাকা কাছে নাই যে ধমক দিবে, এমন কি মা কি ঠাকুরমাও নাই যে মুখের ঘাম মুছিয়া—কি গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া খেলার মধ্যে বিরতি আনিবে।

রোজ, প্রত্যহ গোপাল আসিয়া যখন থেকে চোখ টিপিয়া ছাড়িয়া দেয়, এই খেলা আরম্ভ হয়—শেষ হয় যমুনাতীরের সন্ধ্যাবেলার সূর্য ভোরবেলায় যখন খোকাদের ঘরের সামনে নন্দদের অশথগাছের পাতায় পাতায় রঙের ছিটে ছড়াইতে থাকে।

খুকী ভাবে ঠাকুর পুতুল। কচি মেয়ে—ভাবুক ; কিন্তু খোকা জানে ঠাকুর কে ; খোকা জানে ঠাকুরের হাতের বালার নিচে তাঁর মায়ের বাঁধনে রাঙা দাগ লুকান আছে। ঠাকুরমাও বলে—আছে। খোকা যেমন ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছে, ঠিক তেমনই করিয়া গোপাল বলে, "এ দাগ আমার সোনার বালার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। এই দাগের লোভেই তো মায়ের ভাঁড় থেকে ননী চুরি করি আমি।"—খোকা ঠিক বোঝে না কথাটা—বাঁধনের দাগ কেন লাগিবে ভাল ?

গোপাল পাথরের গোপাল হইয়া লুকায়, যখন যমুনাতীরের গোপাল হইয়া যায়, মায়ের বাঁধনের রাঙা দাগ মেলিয়া ধরে।

এক এক দিন পূজার সময় প্রসাদের জন্ত বসিয়া বসিয়া খোকা এই লুকোচুরির ঠাকুরের চোখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার যেন এক একবার মনে হয় কালো পাথরের ওপর টানা সাদা চোখে কি একটা হয় —মনে হয় একটা দুষ্টু হাসি চোখের কোণে আস্তে আস্তে ঢুকিয়া পড়িয়া গোপালের সমস্ত মুখটাতে ছড়াইয়া পড়ে। প্রায় কথাই কওয়ার মত কি

এক ধরণের হাসি, কত দিনের চেনা—যমুনাতীরের কত কি সব যেন চারি ধারে ওঠে জাগিয়া।

আবার সব মিলাইয়া যায় ;—হাসি, বাঁশি, সুদামভাই, ফোটাফুলে-ভরা কদমগাছ, পেখমধরা ময়ুর—সব। খোকা ঠাকুরের চোখের দিকে চাহিয়া খোঁজে, যত খোঁজে ততই আরও পায় না ; ভাবে ঠাকুরমার গোপালের হাসিটি পর্যন্ত কি লুকোচুরিই না জানে!—ভয়ানক আশ্চর্য বোধ হয় খোকার।

[৩]

আজ কয়েক দিন হইতে সমস্ত বাড়িটি বড় বিষণ্ণ হইয়া আছে। ঠিক এ-ধরণের অভিজ্ঞতা খোকার জীবনে এ পর্যন্ত হয় নাই। বাবা ডাকিয়া আদর করিতেছে না, খোকাকে তো নয়ই, এমন কি খুকীকে পর্যন্ত নয়। কাকা বই হারাইলে আগে মারিত তাহার পর আদর করিত ; বেশি মারিলে খেলনা পর্যন্ত কিনিয়া দিত এমন আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটিয়াছে কয়েক বার। আজ দুই দিন হইতে বই কোথায় আছে তাহার খোঁজই করে না। খোকার মনটা এক একবার যেন কান্নায় ভরিয়া ওঠে, শুধু কি লইয়া কাঁদিবে বুঝিতে পারে না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে। আজ সকালে বাবা কোথায় গেল? আগে যখন কোথাও যাইত, খোকাকে খুকীকে চুমা খাইয়া যাইত ; আজ ঠাকুরমাকে আর কাকাকে কি বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। খোকার ঠোঁট ফুলিয়া যাইতেছিল বলিয়া কপাটের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বাবা তো ডাকিলও না একবার!

ওদিকে মায়ের অসুখ। কাকা বলে খুব শীঘ্র ভাল হইয়া খোকাকে আর খুকুকে আদর করিবে বলিয়া খুব ঘুমায়। কাকা ঘুম ভাঙাইতে বারণ করিয়াছে খোকাকে। খোকা কখনও তো মাকে জ্বালাতন করে না খুকীর মত। বড়রা কখনও মাকে জ্বালাতন করে? কিন্তু মাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনটা যে ছটফট করিতেছে।

খোকা দিনগুলাকে আবার সেই পুরান খাতে চালাইবার জন্য নিজেই একবার ওপরপড়া হইয়া চেষ্টা করিল। কাকার সবচেয়ে মোটা ডাক্তারী বইটা কাঁধের ওপর সাপটাইয়া লইয়া কাকার ঘরের দরজার পাশে গিয়া দু-একবার উঁকি মারিল, তাহার পর প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া চৌকাট ডিঙাইয়া বলিল, "কাকা, কি দুষ্টু খুকু!—তোমার বইটা লুকিয়ে রেখেছিল ভাগ্যি আমি...."

কাকা ফিরিয়া চাহিতে খোকা দেখিল, কাকার চোখ জলে ভরা? কাকাকে তো কেহ মারে নাই, তবে?...খোকার মনটা কি রকম হইয়া উঠিল। কাকা যদি বলিত, "খোকা তোমারই কাণ্ড বই লুকুন"—তাহার পর যদি চিরাচরিত পদ্ধতিমত একটা চাপড় বসাইয়া দিত, খোকা রাজি ছিল—তাহার পর আদর না করিলেও তাহার দুঃখ ছিল না। চোখে জল দেখিয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এ দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই,—বড়রা কাঁদিবে কেন? কে তাহাদের মারে?

বইটা আস্তে আস্তে কোন রকমে এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া খোকা চোরের মত গা লুকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার মনটাতে কি রকম একটা হইতেছে—কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব—খোকা চাহে না কেহ তাহাকে এ-অবস্থায় দেখিয়া ফেলে—কাকা, ঠাকুরমা, কেহই নয়, এমন কি খুকী পর্যন্ত নয়।....তাহার পর আবার কি হইল খোকা বুঝিতে পারিল না—তবে এই না-মার খাওয়া, না-বকুনি খাওয়ার অপমানে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কাকা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে কোলে জড়াইয়া মুখ নিচু করিয়া প্রশ্ন করিল, "খোকা তুই কাঁদছিস? কেন রে? মার জন্যে মন কেমন করছে? মাকে তো গোপাল ভাল করে দেবেন, কান্না কিসের? চল্ দিকিন, সারদার দোকান থেকে তোকে নতুন একটা খেলনা কিনে দিই...."

মায়ের নামে খোকার মনে সেই কেমন-কেমন ভাবটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। আবাব অন্য দিক দিয়া সে যেন একটা কূল পাইল—কিছু বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ যে একটা কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহার জায়গায় মাকে লইয়া দুঃখ, অভিমান—খোকা যেন একটা আশ্রয় পাইল। মা'র সে তত ভক্ত নয়, ঠাকুরমা আর কাকা লইয়াই তাহার জীবন, তবু খোকা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "মা'র কাছে যাব আমি..."

ভাল করিয়া প্রকাশ্যে কাঁদিয়া বাঁচিল যেন।

কাকা বলিল, "নিশ্চয় যাবি, বাঃ, যাবি নি!....তোর মা এখন ঘুমুচ্ছে খোকা, যেই উঠবে তোকে নিয়ে যাব! ততক্ষণ খেলনা নিয়ে আসি গে চল্।....খুকুর জন্যে কি খেলনা নিবি খোকা?....খুকুকে যে বড্ড ভালবাসে খোকা আমাদের; দাদা হয়, বাসবে না? বা রে!"

খোকার আর কান্না নাই, তবে চোখে জল আছে এবং কান্নার বিরামে এক-একবার ফুপাইয়া উঠিতেছে। বলিল, "খুকু ভারি দুষ্টু—মা'র মুনা খা'ব বলে।"

"হ্যাঁ, খুকু ভা—রি দুষ্টু, মাকে ঘুমোতে দেবে না, খালি বলবে মুনা খাব। কৈ খোকা তো বলে না...খোকাকে খুব বড় খেল্না দিতে হবে। চল, কিনে নিয়ে আসি...."

নামিয়া উঠান দিয়া যাইবে, ওদিককার ঘর থেকে ঠাকুরমা বাহির হইয়া আসিলেন, ডাকিলেন, "বড়খোকা, কোথায় যাচ্ছিস ওকে নিয়ে? এদিকে আয়।"

খোকা হওয়ার পর খোকার কাকা বড়খোকা হইয়াছে, কতকটা শঙ্কিত ভাবে মার পানে চাহিয়া খোকাকে লইয়া অগ্রসর হইল! কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছে বৌদি? আবার বাড়ল নাকি?"

মা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "বুঝছি না। খোকাকে দেখতে চাইছে, আয় নিয়ে একবার বাছা, কোন দোষ হবে না।"

ছেলে একটু ভাবিল। ডাক্তার বলিয়া গেছেন, ছেলেমেয়েকে দূরে দূরে রাখিতে একটু—কাছে থাকিলে ভাবাবেগে মুমূর্ষু রোগিণীর আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে!...অথচ যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অভাবের বেদনাও তো কম আশঙ্কার বিষয় নয়।

সে মাত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বৌদির সংকটের কথা শুনিয়া আজ তিন দিন আসিয়াছে। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার করুণাবাবু মহকুমায় গিয়া কি করিয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, কাল রাত্রে আসিবার কথা ছিল, আজ এখন পর্যন্ত আসেন নাই, এদিকে রোগিণীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডাক্তার আসে না দেখিয়া দাদা নিজে আজ সকালে মহকুমায় গিয়াছে, করুণাবাবু না আসিতে পারেন, অন্য ডাক্তার লইয়া আসিবে। বড়খোকা অকূল পাথারে পড়িয়াছে।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও মা, বুকটা একবার দেখে নিই।"

ঘর হইতে স্টেথস্কোপটা আনিয়া রোগিণীর ঘরে প্রবেশ করিল। একটু পবে বাহির হইয়া আসিল—মুখটা খুব বিষণ্ণ।

মা চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না।

বড়খোকা খোকার হাতটা ধরিয়া বলিল, "চল্ খোকা, মা'র তোর ঘুম ভেঙেছে!"

খোকা আজ দু-দিন পরে মা'র কাছে আসিল। ঘরের বাতাসটায় কি একটা আছে, খোকার বড় ভয় করিতেছে। মাকে এ-রকম কখনও দেখে নাই, এত রোগা...পরশুও তো মা'র অসুখ ছিল, দাওয়ার রোদে বসিয়া তাহাকে গল্প বলিয়াছে, খুকুর পুতুলকে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। মাকে দেখিয়া ভয় করে আজ!

মা ইসারা করিয়া খোকাকে ডাকিল। খোকা পা উঠাইতে পারিল

না, ঠাকুরমা'র কাপড়টা খামচাইয়া ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুরমা এক হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "চল দাদু, মা ডাকছে "

কতকটা জোর করিয়াই খোকাকে তুলিয়া খাটের ওপর মা'র কাছে বসাইয়া দিল। খোকার এমন বিচিত্র অনুভূতি জীবনে কখনও হয় নাই, ভয়ে, লজ্জায়, আরও সব কিসে-কিসে সে জড়সড়, মায়ের দিক্ থেকে মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল।…মা আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে, চোখ দিয়া আস্তে আস্তে জল গড়াইয়া পড়িতেছে…অনেকক্ষণ পরে—প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, এই রকম আওয়াজে বলিল, "কেঁ'দ না যেন, সোনা আমার।"

ঠাকুরমা খোকাকে বুকে চাপিয়া নামাইয়া লইয়া বাহিরে আসিল। কাকা ঘরেই রহিয়া গেল।

খোকা মুখ তুলিতে সাহস করিতেছে না; বাহিরে আসিতে আসিতে ঠাকুরমারও কান্না নামিল নাকি?

[৪]

একটা অব্যক্ত ভয় যেন খোকার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। খোকা অসুখ কাহাকে বলে জানে। অসুখে লেপ মুড়ি দিয়া কাঁপে লোকে, সাবু খায়, কাজ না করিয়া দাওয়ার রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর গোপাল ভাল করিয়া দেন—দু দিন পরে রুটি খায়, তাহার পর ভাত। খোকার কাছে অসুখের এই স্বরূপ বিশেষ অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ এটা কি? গোপাল এখনও ভাল করিয়া দেন নি কেন?… এর পরের অবস্থাটা খোকার অভিজ্ঞতার একেবারেই বাহিরে—চিন্তার মধ্যেই আসিল না…তবে অন্য সব নানান রকম প্রশ্ন—বিশেষ করিয়া

গোপালের এই নিশ্চিন্ততা তাহার সমস্ত চিন্তাকে জুড়িয়া তাহার মনটা ভার করিয়া রাখিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা ;—মা'র কত কষ্ট হইতেছে। না, মা ভাল হইয়া যাক,—এ-মাকে দেখিলে ভয় হয়—মিছামিছি কান্না আসে, বড় কষ্ট হয়···

মাকে দেখার পর হইতে সমস্ত বিকালটা খোকা খুব শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হইয়া রহিল, সন্ধ্যাব সময় হঠাৎ সে বায়না ধরিল।

বায়নার কোন হিসাব নাই। আরম্ভ করিল মা'র কাছে যাইবে বলিয়া, সন্ধ্যাব সময় রোগিণী আরও নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে, কাকা বলিল, "একটু থাম্ খোকা, আবার তোকে যাব নিয়ে··· খোকা গিয়ে মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, তাইতেই তো ওর মা ভাল হয়ে যাবে।···· খোকা, তুমি বড় হয়েছ, দাদার চেয়েও বড় খোকা, খোকাই তো বাড়ির কর্তা এখন। কই, খোকা তোব মাকে ডাক্তার হয়ে দেখছি— টাকা দে···!"

রহস্যটা করিয়া কাকা হাসিয়া উঠিল, খোকা কিন্তু যোগ দিল না। তিনটা আঙুল মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "মার কাছে যাব।"

কাকা অশেষ প্রকারে খোকাকে বড়, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, লক্ষ্মী প্রতিপন্ন করিল, কত রকমের প্রলোভন দিল; সব কথার শেষেই খোকার ওই একটি কথা, "মার কাছে যাব।"

আব্দার যখন কান্নায় দাঁড়াইল খোকাকে বাহিরে লইয়া যাইতে হইল, এবং সেখানেও যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, কাকাকে হার মানিয়া রাজি হইতে হইল। খোকা বলিল, "না, যাব না, আগে কেন নিয়ে যাও নি?" ·· কত সাধ্যসাধনা, ওদিকে মাও একবাব দেখিতে চাহিয়াছে—কোন মতেই যাইবে না খোকা—তাহাকে আগে কেন লইয়া যাওয়া হয় নাই? ···মা ছাড়িয়া জিদটা দাঁড়াইল খাওয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই না-খাওয়া লইয়া—

আরও যত রকমের সব আদাড়ে জিদ। কোল মানে না, শাসন মানে না —কাকা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল....।

রোগিণীর কাছ থেকে উঠিবার জো নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরমাকে উঠিয়া আসিতেই হইল। বলিলেন, "তুই বোস গিয়ে বড় খোকা বৌমার কাছে, আমি আসি একটু সামলে ওকে।....যতীন এ-গাড়ীতেও এল না.... আজকের রাতটা..."

নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া আঁচলে চক্ষু দুইটা মুছিয়া বলিলেন, "শ্রীহরি শ্রীহরি....এস তো দাদু, আজ অত আব্দার করতে আছে? মাকে তাহলে গোপাল ভাল করে দেবেন কি করে?"

ঠাকুরমার কাছে আসিয়া খোকা অল্পক্ষণেই শান্ত হইয়া গেল। বধূ অসুখে পড়া পর্য্যন্ত নবীনের মা রান্না করিয়া দিতেছে। ভাত লইয়া কত গল্পের সহযোগে নাতিকে খাওয়াইয়া ঠাকুরমা বিছানায় উঠিলেন। নবীনের মার মেয়ে খুকাকে ঘুম পাড়াইয়া শোওয়াইয়া গিয়াছে, এক দিকে নাতনী আর এক দিকে নাতিকে লইয়া ঠাকুরমা শুইলেন। তাহার পর গল্প আরম্ভ হইল।

"গোপালকে ক্ষীর নাড়ু দিও না ঠাকুমা, আগে মাকে ভাল করে দিন···কি করছেন গোপাল, ঠাকুমা? তুমি বলেছিলে গোপালকে ঠাকুমা?"

"বলেছিলাম বই কি দাদু, আজ থেকে বলছি? কতবার বলেছি— তোমাদের ভালয় ভালয় রেখে যেন যেতে পারি। কতবার বলেছি— ঠাকুর, আমার তো হ'ল ঢের, এবার ডেকে নাও আমায়। তা কাকে ডাকতে কার ডাক পড়ল···"

কান্নাটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

খোকা ঠিক বুঝিতেছে না—প্রশ্ন করিল, "কেন ডাকবেন ঠাকুমা?— খেলবার জন্যে?"

ঠাকুমা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "ঘুমো দাদু একটু তাড়াতাড়ি আজ। মনটা তোর মার কাছে পড়ে রয়েছে।"

খোকা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল একটু, কিন্তু গোপালের আচরণ লইয়া মনে অজস্র প্রশ্ন যাওয়া-আসা করিতেছে, ঘুম আসিবার পথই বন্ধ। একটু পরে ধীরে ধীরে ডাকিল, "ঠাকুমা।"

ঠাকুরমা বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, বলিলেন, "ঘুমোস্ নি এখনও ? এই দেখ !"

খোকা তাহার দুর্ভাবনার একটা যেন সমাধান পাইয়াছে, অনেক ভাবিয়া ; বলিল, "তোমার কথা গোপাল বোধ হয় শুনতে পান নি।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "হবে," তাহার পর উদ্গত অশ্রুর সঙ্গে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তিনি সব শোনেন, শুধু আমার কথাই শুনতে পান না কেন দাদু—কি দোষ করেছি আমি ?"

এ তো আরও গুরুতর সমস্যা। খোকা আরও ভাবিল, তাহার পর বলিল, "বোধ হয় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন, ঠাকুমা।"

ঠাকুমা বলিলেন, "ঠিক ধরেছিস দাদু তুই, ওঁর বাঁশিই হয়েছে কাল, ঘরে ঘরে আগুন লেগে যাচ্ছে, এত লোকের হাহাকার কান্না ওঁর কানে যায় না। চাষের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, গেরস্তর গোলায় ধান নেই, অত সাধের ধেনু তাঁর—তারাও এক মুঠো খড় পায় না। এদিকে কেউ নাড়িছেঁড়া ধন শ্মশানে দিয়ে আসছে—আমিই এই ঘরের লক্ষ্মী সোনার প্রতিমে বিদায় দিতে বসেছি—এত দুঃখু, এত হাহাকার তাঁর কানে যায় না। বাঁশি নিয়েই তিনি বিভোর। থাকুন, কিন্তু আমায় আর এত দগ্ধাচ্ছেন কেন দাদু ?"

কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় ঠাকুরমা প্রশ্ন করিলেন, "ঘুমোলি দাদু ?"

খোকা হাতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া বসিল, উৎসাহের সহিত বলিল, "ঠাকু'মা, বাঁশি ভেঙে দেবে,—কুটিলা যেমন দিয়েছিল ?"



ঠাকু'মা, বাঁশি ভেঙে দেবে,—কুটিলা যেমন দিয়েছিল ?

এত দুঃখেও ঠাকুরমার মুখে হাসি আসিয়া পড়িল, না ঘুমাইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া নাতি একটা মতলব ঠাহর করিয়াছে বটে। বলিলেন, "তাই হবে'খন ; তুই এখন ঘুমো দাদু একটু। পিদ্দিমটাও নিবে আসছে।" চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। খোকার কিন্তু আজ অনেক সমস্যা—গোপালের এই এত ব্যাপারের মধ্যে বাঁশি বাজানোর ব্যাপারটা তাহার অধিকতর দুর্বোধ্য এবং ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ খেলার সময় খুব রাগিয়া গোপালকে বলিবে সে।

অনেকক্ষণ কাটিল—অন্য বারের চেয়েও কিছু বেশিক্ষণ—তাহার পর খোকা আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঠাকু'মা।"

"কি রে ডাকাত? দেখ তো কাণ্ড!"

"আমি ঘুমুচ্ছি কি না জিগ্যেস করলে না?"

"তুই তো জেগে রয়েছিস্ দেখছি।"

"এইবার ঘুমুব। সত্যি, তুমি চোখে হাত দিয়ে দেখো…"

ঠাকুরমা খানিকক্ষণ পরে ডাকিয়া সাড়া পাইলেন না। কিন্তু কি ভাবিয়া একবার চোখে হাত দিয়া বুঝিলেন, খুব জোরে চোখ বুজিয়া থাকিবার জন্য খোকার নাক মুখ সব কুঁচকাইয়া রহিয়াছে এবং চোখের পাতা একটু একটু কাঁপিতেছে। হার মানিয়া বলিল, "এই তোমার ঘুম? তবে থাক শুয়ে তুমি—নবীনের মাকে ডেকে দিই। আর তোমার সঙ্গে গল্প করলে আমার চলবে না।"

[৫]

সমস্ত রাত বধূকে লইয়া মাতাপুত্রে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। পুত্র প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভ্রাতৃজায়াকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের অসম্পূর্ণ ডাক্তারী বিদ্যায় যতটা কুলায় চেষ্টা করিয়াছে—মা করিয়াছেন অতন্দ্রিত প্রার্থনা—গোপালের কাছে—"হে ঠাকুর বাঁশি ছাড়, ফিরিয়ে দাও আমার সোনার কমল—ছাড় বাঁশি একদিনের তরেও, নইলে শিশুর মুখেও তো দুর্নাম রয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে…"

রোগিণীর অবস্থা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। ভোরের একটু আগে

একবার খোকা আর খুকীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তুলিয়া দু-জনকেই দেখান হইল। তাহার পর হইতে আরও নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

* * *

ভোর হইয়া গেছে। বড়খোকা নিজের ঘর হইতে একটু যেন ব্যস্ত হইয়া আসিল। রোগিণীর বিছানার এদিক ওদিক, বালিসের নিচে কি একটা খুঁজিতে লাগিল উদ্বিগ্ন ভাবে। মা প্রশ্ন করিতে বলিল, "স্টেথস্কোপটা পাচ্ছি না,—একটু আগে বৌদির বুকটা দেখে নিয়ে গেলাম ওঘরে—"

মা প্রশ্ন করিলেন, "নেই?"

"না—একবার বুকটা দেখতে হবে যে! বেশ মনে পড়ছে নিয়ে গিয়ে বাইরে চেয়ারের হাতলটায় রেখে মুখটুক ধোয়া সেরে নিতে গেলাম। আধ ঘণ্টাও হয় নি, ফিরে এসে দেখি!...."

পাড়ায় হনুমানের উপদ্রব, কি যে হইয়াছে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। মায়ের হাতটা বধূর মাথার উপর জপে নিরত ছিল, উগ্র নিরাশায় টানিয়া লইয়া বলিলেন, "সব নাও ঠাকুর, চিকিচ্ছের সান্ত্বনাটুকুও আর রেখ না—"

চোখে অঞ্চল দিয়া বধূর শিয়র হইতে নামিয়া কতকটা জোরেই কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় বাহিরে কড়া-নাড়ার শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলের গলার আওয়াজ, "মা, বড়খোকা!"

বড়খোকা তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দাদা আর করুণা ডাক্তার। দাদা শুধু প্রশ্ন করিল, "আছে?"

করুণা ডাক্তার গিয়া রোগিণীর পাশে বসিল। শান্ত প্রকৃতির লোক, ধীরে ধীরে হাতটা তুলিয়া লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়িটা পরীক্ষা করিল, তাহার পর "হুঁ—" করিয়া ধীরে ধীরে একটা শব্দের সঙ্গে বড়খোকার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দিয়েছিলে?"

"খুব খারাপ অবস্থা দেখে একটু মকরধ্বজ..."

ডাক্তার রোগীর দিকে চাহিয়া ভেতর পকেটে হাত দিয়া একটু থমকিয়া গেল, বলিল, "হুঁ, ঠিক ফেলে এসেছি, যতীন যা তাড়া দিলে, দেখি তোমার স্টেথস্কোপ্‌টা।"

বড়খোকার মুখটা একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "সেটা পাচ্ছি না, বাইরে রেখেছিলাম, বোধ হয় হনুমানে...."

মা একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও করুণা তুমি ওকে রাখতে পারবে না বাবা, গোপালই আজ বিমুখ আমার ওপর—সব পথ বন্ধ করে..."

ডাক্তার বৃদ্ধার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "চুপ কর খুড়ী।... বড়খোকা, তুমি একবাব ছোট আমার ওখানে সাইকেলটা নিয়ে। আর যতীন তুমি দেখ ভাল করে খুঁজে—হনুমানেরা এখন ঘুমুচ্ছে, স্টেথস্কোপের লোভে কেউ ঘুম ছেড়ে উঠবে না।"

হারাইলে লোকের প্রকৃতিই হইতেছে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই খোঁজা। সম্ভবপর জায়গায় গেল না পাওয়া, তখন অসম্ভব জায়গায় খোঁজ পড়িল এবং গেল পাওয়া।

পূজার ঘরটা একটু ওদিকে একটেরেয়। দেখা গেল—ঘরের দুয়ারটা খোলা এবং চৌকাঠের সামনে একটা কাঠের চেয়ারের উপর একটা বেতের মোড়া বসান। স্বভাবতই একটু কৌতূহল হয়।

ঘরের মধ্যে গিয়া যতীন যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—

ঠাকুরের হাতে রূপার ডাণ্টির ছোট বাঁশিটা নাই, নিচে দুই খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে।

শুধু তাহাই নয়, বাঁশির জায়গায় দুই হাতের আঙুল দিয়া গলান

একটা স্টেথস্কোপ।···ঠাকুরের সাদা সাদা চোখের নির্বিকার দৃষ্টি শূন্যে চাহিয়া আছে।

হাত পা ধুইয়া রাত্রের কাপড় ছাড়িয়া স্টেথস্কোপটি গোপালের হাত হইতে সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। ততক্ষণে বড় খোকাও ওদিক হইতে ডাক্তারের নিজের স্টেথস্কোপ লইয়া সাইকেল হইতে নামিল।

* * *

ডাক্তার সব শুনিল। নিজের ভাল স্টেথস্কোপটাই হাতে করিয়াছিল, একবার কি ভাবিল।····সমস্ত গ্রামটাই বৈষ্ণবপ্রধান।····ধীরে ধীরে ফিরাইয়া দিয়া যতীনকে বলিল, "দাও তোমারটাই দেখি।"

ভাল করিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া একটা শান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "মকরধ্বজটা কাজ করেছে। হার্টের এক্শনটাও ভাল।—কই, গোপালের শাসকটি কোথায় লুকুলেন?"

[১৩৪৮]

দেশের মেয়ে

[১]

মিত্র গৃহিণী বলিলেন, "ছ'বছর ধরে ছেলে চাকরি করছে—যেমন তেমন চাকরি নয়, দারোগা-গিরি—লোকে জন্মিয়তি ছেড়ে যা' কামনা করে,—পাড়াগাঁয়ে থাকা, তাও আবার এ-দেশের পাড়াগাঁ;—ছেলের তোমার কিন্তু শরীর ফিরছে কৈ বৌদি?"

কথাটা সত্য নয়; বসন্তের শরীর বেশ ফিরিয়াছে; স্বাস্থ্যহীনদের শরীর ফিরাইবার জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট—দারোগাগিরির প্রবর্তন করিয়াছে এমন নয়,—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আছে, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, সুনিদ্রার ব্যাঘাত—তবুও বিহারের পাড়াগাঁয়ের দুধ ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবারের জোরে এবং অগাধ একাধিপত্যের আনন্দে বসন্তের শরীর বেশ ভাল ভাবেই স্থূলত্ব লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালীর শরীরের যা চরম উৎকর্ষ। মিত্র-গৃহিণীরও যে সম্প্রতি দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়াছে এমন নয়। প্রকৃত কথাটা এই যে, তিনি আজ বসন্তের সেজ ভাইয়ের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের কথাটা পাড়িতে আসিয়াছেন। মনে মনে—একটা যুৎসই গৌরচন্দ্রিকার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা লইয়া বসন্ত বাহির হইতে আসিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিল।

বসন্তের মা বিমর্ষভাবে বলিলেন, "সে কথা কে বলবে বল ঠাকুরঝি? বললেই একরাশ জামা বের করে বলবে, 'এইটে ছোট হয়ে গেছে, এইটে সেলাই খুলে পড়ছে, সাত সের ওজন বেড়েছে।'....দাঁড়িপাল্লা ধরে মানুষ ওজন করা! আমি হার মেনে বলা ছেড়ে দিয়েছি বাপু...কইগো বৌমা, তোমার পিসশাশুড়ীকে পান জর্দা দিয়ে যাও।"

"আসছে, ব্যস্ত কিসের ?···হ্যাঁ, আজকাল ঐ এক ওজন - ওজন বাই হয়েছে। সেদিন নস্তে এসে বললে, 'মা, কাকার তিনটাকার মাংস বেড়েছে'···'সে কিরে ?' 'হ্যাঁ গো, ছ-আষ্টে আটচল্লিশ, তিন ষোলং আটচল্লিশ'···বুঝতে কি পারি ? শেষে টের পেলাম হাঁসপাতালের কলে তৌল করে দেখা গেছে খুড়োর নাকি আট সের ওজন বেড়েছে ; গুণধর ভাইপো ছ-আনা করে তার হিসেব করে লাভ দেখাচ্ছেন—বাজারে পাঁঠার যা দর আর কি !···"

একটা হাসির রোল উঠিল। সেটা থামিলে দম লইয়া মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "জ্বালার কথা আর ব'লো না। বসুর আমাদের কিন্তু তদারকের দরকার হয়ে পড়েছে বৌদি। বেটাছেলে যদি নিজের শরীরের হেফাজৎ করতে পারত তো আর ভাবনা ছিল না। বৌমাকে সঙ্গে দিচ্ছ না কেন ?"

"এই প্রথম ঘর করতে আসা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, একটা সংসার ঘাড়ে করতে কি পারবে এর মধ্যে ?"

"ওমা, পারবে না,···আর সংসার করা তো তোমার আশীর্বাদে ঝি-চাকর-ঠাকুরদের ওপর নজর রাখা ; কিসের অভাব গা বসন্তর আমার ? আর অন্য দিকেও তো দেখতে হবে বাপু। বৌদি আমার সেই নিজের প্রথম ঘর করতে আসার কথা ধরে বসে আছেন—এগার বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এলেন, নাকে নোলকটি দুলদুল করছে—লক্ষ্মী-প্রতিমের মতন ; এখনও চোখের ওপর যেন ছবিটি লেগে রয়েছে আমার···"

বসন্তের মা একটু লজ্জিতভাবে মিত্র-গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর উনি তখন পাকা গিন্নি !···একাল সেকালের তফাৎ বুঝি ঠাকুরঝি, মনে করেছিলাম মাস দু'তিনের জন্যে না হয় দিই সঙ্গে করে ; আবার ভাবছি···"

বধূ পান-জর্দা আনিয়া মিত্র-গৃহিণীর হাতে দিয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। চিবুক-স্পর্শে চুম্বন করিয়া পাশে বসাইয়া মিত্র-গৃহিণী

প্রশ্ন করিলেন "হ্যাঁগো, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে—থাকতে কষ্ট হবে নাকি নবারের ঝির ? আমি তো বাছা তখন থেকে তোমার শাশুড়ীর কাছে তোমার বাপের যশ গাইছি—ও সোজা লাঙলঠেলা চাষার মেয়ে নয়, খুব পারবে—নাগো বৌদি, কোন ভয় নেই, ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, কাজকর্মে বুদ্ধিতে মা আমার ঠিক আমার পুঁটুর মতন চৌখস মেয়ে, ভাবও তেমনি দু'টিতে, যেন ঠিক মায়ের পেটের বোন। সেদিন পুঁটু এসেছিল, ঠায় চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম কি না—দু'টিতে এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছিল, এমন মানাচ্ছিল।... এতো তোমার এখানকার জর্দা নয় বৌদি !"

জর্দাটা এখানকারই ; মিত্র-গৃহিণীর রসনায় যে অপরিচিত এমন নয়। বসন্তের মা বলিলেন, "লক্ষ্মৌয়ের ; তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে একটু এনে দাও না বৌমা।"

"তা দাও, একটু মুখ বদলান হবে মাঝে মাঝে...তুমি ঐ কর বৌদি ; না বাপু, ছেলেটার দিকে যেন চাইতে পারা যায় না, আর সত্যিই তো গা·· "

"বলব ওঁকে আজ ; সত্যি ক'দিন থেকে দোমনা হয়ে রয়েছি ছেলেটার শরীর দেখে····"

"শোন,কথা বৌদির ! উনি দাদার রায় নেবেন ! কার রায়ে এত বড সংসারটা চলছে সেকথা যেন আমার কাছেও লুকোন আছে !"

বধূর পিঠে একটা সস্নেহ স্পর্শ দিয়া বলিলেন, "এই সোনার প্রতিমেই কে পছন্দ করে ঘরে এনেছিল গা ?"

[২]

এই অধ্যায়টি বসন্তের সহধর্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর একটু পরিচয় দিয়া আরম্ভ করা ভাল। সে নূতন ঘর করিতে আসিয়াছে এবং জন্ম-তারিখের হিসাবে বোধ হয় অপ্রাপ্তবয়স্কাও বলা চলে, তাই বলিয়া তাহাকে

কাঁচা মেয়ে মনে করিলে বেজায় ভুল করা হইবে। তাহার বিবাহ হইয়াছে পশ্চিমের এক দারোগার সহিত,—তাহার মা, খুড়ী, পিসি এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন এবং সাধ্যমত তাহাকে এইরূপ রুক্ষ দেশ এবং উগ্র স্বামীর জন্য—তামিল দিয়া পাঠাইয়াছেন। মেয়েটি বাহ্যত বেশ ধীর, নম্র এবং হাস্যময়ী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় গম্ভীর, সন্দিগ্ধ, সতর্ক, এবং এ গাম্ভীর্য, সন্দিগ্ধতা ও সতর্কতা বিশেষ করিয়া দুইটি বিষয়ে পরিস্ফুট,—প্রথমত এদেশের লোকের সম্বন্ধে, স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে ; দ্বিতীয়ত স্বামীর সম্বন্ধে। অনেক মাস্টার আছে যাহারা টেবিলে বেঞ্চে, এমন কি দু'একটা নিরীহ পৃষ্ঠেও বেত আছড়াইয়া তবে সেদিনের কার্য আরম্ভ করে ; তাহাতে নাকি ফল ভাল হয়। বসন্তের নবীন দাম্পত্য-জীবনের সব খুঁটিনাটির হিসাব রাখা সহজ নয় ; মোটামুটি এই কথা বলা চলে, হিরণ স্বামী সম্বন্ধে মূলত মাস্টারের নীতি অবলম্বন করিয়াই সংসার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বসন্ত-দারোগার অমন কুলোপানা চক্র এবং ফোঁসফোঁসানি এক জায়গায় আসিয়া যে কিরূপ নিষ্ক্রিয়—তাহা পরে দেখা যাইবে। আগে বসন্ত ছিল অখণ্ড,—দারোগাবাবু বলিলেই তাহার পরিচয় পূর্ণ হইয়া যাইত ; এখন তাহার দুইটা সত্তা আছে,—দারোগা-বসন্ত এবং স্বামী বসন্ত।

দারোগা এবং স্বামী এই পদবী দুইটি বাঙ্গালীর অভিধানে তুল্যার্থক হইলেও এ ক্ষেত্রে কোন মিল নাই—দারোগা বসন্ত যে পরিমাণে উগ্র, স্বামী বসন্তটি ঠিক সেই পরিমাণে নিরীহ হইয়া আসিতেছে। কথাটা যে নিতান্ত মনগড়া নয় পরবর্তী কাহিনীতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মিত্র-গৃহিণীর পরামর্শে বসন্ত হিরণ্ময়ীর অভিভাবকত্বে যখন কর্মস্থলে আসিয়া হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। স্টেশন হইতে ষোল মাইল পথ, সওয়ারি—বলদের পাল্কি-গাড়ি, স্থানীয় ভাষায় শাম্পেনি বলে।

বসন্ত যতক্ষণ একবার থানাটা তদারক করিয়া আসিতে গেল

ততক্ষণ হিরণ একবার সমস্ত বাড়িটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দক্ষিণ ও পশ্চিমে দু'সারি ঘর, মাঝখানে পাঁচিল দিয়া ঘেরা উঠান। উঠানের এক কোণে, একটি পাতকুয়া. পাশেই একটা জেয়ল গাছে আড়াআড়ি ভাবে একটি ধনুকাকার বাঁশ বাঁধা, তার এক দিকে ছিপের আগায় বঁড়শির মত একটা বড় অর্ধডিম্বাকার বালতি ঝুলিতেছে, অন্য দিকে ভারসাম্যের জন্য একটা ঢেকির আধখানা বাঁধা। সব মিলিয়া যেন একটা চড়কগাছের মত দেখিতে হইয়াছে।

নিশ্চয় বেশ ভাল করিয়া বাঁধাছাঁদা আছে, তবুও কেমন মনে হয় বাঁশ-বালতি ঢেকি তিনটিই যেন ঘাড়ে পড়িবার চক্রান্ত করিয়া মাথার উপর আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে। এ-জাতীয় জিনিস হিরণ এর পূর্বে দেখে নাই—বাংলা দেশে তো নয়ই, শ্বশুরবাড়ি আসিয়াও নয়। মনে মনে মা-কালীকে স্মরণ করিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। মনটা একটু খিঁচড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের দিকে গেল। রসুইয়া-ঠাকুর মনিব আসিতেই একবার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিজের এলাকার মধ্যে আসিয়া চা আর হালুয়ার বন্দোবস্ত করিতেছিল। নবাগতা কর্ত্রীকে তাহার ঘরের দুয়ারে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল এবং তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

লোকটা দুর্বল প্রকৃতির, বোধ হয় দারোগার আওতায় এই রকম হইয়া পড়িয়াছে। এই দৌর্বল্যের জন্যেই প্রতি কথাই একটু হাসিয়া বলিতে অভ্যস্ত—খোসামুদি-গোছের একটু মলিন হাসি। হিরণকে ঠায় গম্ভীর-ভাবে দাঁড়াইয়া ঘরটা পর্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি টানিয়া বলিল, "চা আর জল-খৈ রান্না করছি।"

কালো লিকলিকে-গোছের চেহারা। পরণে মাসখানেকের ধুলোময়লার উপর হলুদ-লংকার ছোপধরা একটা কাপড়। কাঁধে তদনুরূপ একখানি

গামছা। শুচিতার পাওনা মিটাবার মত করিয়া পায়ের পাতা দুইটি ধোওয়া, তাহার পর হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় সাদা হইয়া গিয়াছে।



উঠিয়া প্রণাম করিল এবং তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল

প্রণাম করিতে হিরণ নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, সেটা কুশলসূচক হইবে না বুঝিতে পারিয়া লোকটা

পূর্বাহ্নেই নিজের পরিচয়ে যতটা সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিল, "দো বরস্ রংপুরে থাক্‌ছিলাম, সুকতুনি রাঁধতে জানি।"

নাসিকা আরও কুঞ্চিত করিয়া হিরণ বলিল, "তবে আর কি, মাথা কিনেছিস। এত নোংরা, তোর হাতে বাবু খায়?"

লোকটা একটু অপ্রতিভ হইয়া একবার নিজের চেহারার পানে চাহিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, "বরাহ্‌মন্ আছি; দোষ লাগে না।"

হিরণ অল্প কথার লোক, কিছু বলিল না। তাহার নাসিকাটা কুঞ্চিত থাকায় বোঝা গেল সে এতটা নোংরামিকে শুদ্ধ করিয়া লইতে পারে এ পরিমাণ ব্রহ্মতেজের কথাটা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ঝি আসিয়া খবর দিল গা ধুইবার জল তৈয়ার।

হিরণ ঘুরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তুই দিয়েছিস নাকি জল তুলে?"

প্রশ্নের দোষ দেওয়া যায় না। কালো কুচ্‌কুচে রং, আঁটোসাটো, জাঁদরেল গোছের চেহারা; পরণে চৌদ্দ হাতের একটা পালের মত মোটা কাপড়। সামনেই একটা সুপুষ্ট কোঁচা, ময়লা যেন তাহার পরতে পরতে অন্ধকারের মত জমাট হইয়া আছে। কাপড়ের যে-টুকু মাথায় সে-টুকু তেলে-ময়লায় তারপলিন কাপড়ের মত হইয়া গিয়াছে।

ঝিয়েরা কখনও দুর্বল প্রকৃতির হয় না, দারোগার ঝিয়েরা তো নয়ই। প্রশ্নটা বুঝিতে না পারায়—মুখে কাপড় দিয়া অনেকটা বেয়াদবির সঙ্গেই হাসিয়া উঠিল। বলিল, "দুলহীন্ বাঙলা বলাইছতিন্!"—অর্থাৎ ক'নেবৌ বাঙলায় কথা বলছেন আমার সঙ্গে।

ঠাকুর বুঝিয়াছিল প্রশ্নটা, তাহার রংপুর প্রবাসের কল্যাণে; বলিল, "চাকর পানি ভরিয়ে দিয়েছে; তাকে বোলাইয়ে দিই?"

যেমন নমুনা দেখা যাইতেছে, চাকরের চেহারা দেখিলেই যে স্নানের প্রবৃত্তি বাড়িবে, এমন ভরসা হয় না, অথচ স্নান না করিলেও নয়।…"না থাক্; কোথায় জল দেখিয়ে দে, চল্"—বলিয়া হিরণ কাপড়-গামছা বাহির করিতে গেল।

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বসন্ত চা-হালুয়া লইয়া বসিয়া গিয়াছে। বধূকে প্রশ্ন করিল, "কেমন দেখলে সব?"

বধূ মুখটা অতিমাত্র গম্ভীর করিয়া উত্তর করিল, "চমৎকার! সাধে কি শরীর ও-রকম হয়ে গেছে? খেতে প্রবৃত্তি হয় তোমার ঐ ভূতের হাতে? যেমন ঝি, তেমনি ঠাকুর! থাক কি করে?"

"বেশ কাজ করে সব কিন্তু, নিজের সাজগোজের দিকে লক্ষ্য নেই, অসুখ-বিসুখ নেই, কামাই নেই, আমার বেশ একটানা চলে যায়। আর বামুনটা নোংরা আর দেখতে কাঁকলাসের মতন হলেও রাঁধে ভাল, এ তল্লাটে বাঙলা রান্না-জানা লোক আর নেই-ও। তাই নিয়েই আমার দরকার; ওর রান্নাই খাব, ওকে তো আর খাব না।"

শেষের এই রসিকতাটুকুর উদ্দেশ্য হিরণের এই গাম্ভীর্যে একটু আঘাত দেওয়া। অকৃতকার্য হইয়া বসন্ত আর কথা না বাড়াইয়া জলখাবারে মনঃসংযোগ করিল। শেষ হইলে বলিল, "তোমাকেও এনে দিক?"

ঘিয়ে জবজবে সোনার রঙের মত হালুয়া, প্রচুর দুধ দেওয়া ঈষৎ গৈরিক রঙের ঢলঢলে চা, দীর্ঘ আট ক্রোশের যাত্রায় পরিশ্রান্ত মনকে টানে; কিন্তু তাহাদের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়া হিরণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "মা গো!—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে! আগে ওর একটা ব্যবস্থা করি,—তারপর ওর হাতে খাব—যদি প্রবৃত্তি থাকে। ওকে ডেকে বলে দাও আজ ও যাক, কাল যেন নেয়ে-ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে তবে বাড়িতে ঢোকে।…রাত্তিরটা আমি চালিয়ে নেব'খন। ঝিটাকে ডেকে দাও, একটা ফরসা কাপড় দিই।"

বসন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, "তুমি চালিয়ে নেবে মানে? এক আট ক্রোশ পথ শাম্পেনিতে এসে রান্না করবে নাকি? শরীর তো?—না, কি?"

হিরণ স্বামীর চোখের উপর স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "আমি নিজের শরীর দেখবার জন্যে এখানে আসি নি। আমার শরীরের ওপর যদি মশাইয়ের এত দরদ থাকতো তো ঐ ভূতপ্রেতদের হাতে যা'তা খেয়ে নিজের দেহ কালি করতেন না।....আট ক্রোশ ঐ বিদ্‌ঘুটে গাড়িতে গতর চুর করে সত্যি কারোর মেজাজ ভাল থাকে না; সেটি মনে রেখে যা ভাল বুঝছি করতে দাও।...এই দাই!.. চাকরটার নাম কি?"

বেশ বোঝা গেল হিরণ আসিয়া গৃহস্থালির রাশ কড়া হাতে বাগাইয়া ধরিয়াছে। স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী প্রভৃতি এই শকট-সংলগ্ন কোন অশ্বই খাতির পাইবে না তাহার কাছে। বসন্ত খানিকটা এদিক ওদিক করিল, তাহার পর বধূর উপরকার রাগটা চাকর-দাসীদের উপর ঝাড়িয়া অফিসে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িল এবং সেখানেও কণ্ঠস্বরকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া একটা তুমুল রকমের হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। হিরণ বুঝুক সে নেহাৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়; একটা গোটা থানার পুলিস কতোয়াল তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

তারপর প্রায় রাত্রি বারটার সময়—হিরণের হাতের আলুনি তরকারি, পোড়া লুচি এবং ধরা দুধ অজস্র প্রশংসার সহিত আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

[৩]

পরের দিন সকালেই বসন্তকে একটা তদারকে বাহিরে যাইতে হইল। হিরণ বাড়ি-ঘর-দুয়ার তিনটা লোকের সাহায্যে ধুইয়া মুছিয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া লইল। চাকরটা স্নান করিয়া বাবুর একটা ধোপদুরস্ত কাপড় পরিল এবং ভৃত্যোচিত নোংরা কাজ যতটা

সম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঝি মাইজীর ফুল-কাটা চওড়াপেড়ে শাড়ি পাইয়াছে, নিজেকে এবম্বিধ দুর্লভ সম্পদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য প্রায় পো-খানেক মাইল দূরে নদীতে গিয়া চুলে খার আর এটেল মাটি ঘসিতে লাগিল। কাজের অসুবিধা হওয়ায় অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া থানার লোকে তাহাকে ধরিয়া আনিল।

ঠাকুরটা সত্যই রাঁধে ভাল, কিন্তু একজোড়া নূতন কাপড় এবং একটা নূতন গামছা পাইয়া কোন কারণে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া, সব রান্না এমন কি তাহার সবচেয়ে বড় শিল্প সুকতুনি পর্যন্ত বরবাদ করিয়া রন্ধনপর্ব শেষ করিল। এদিককার দেখাশোনা সারিয়া হিরণ যখন স্নান করিতে যাইবে, দেখিল সাবানের বাক্সয় সাবান নাই। আজ সকালেই নূতন সাবান বাহির করিয়া দিয়াছে, বসন্ত মাত্র একবার ব্যবহার করিয়া বাহিরে গিয়াছে। ঝিয়ের কাছে পাওয়া গেল না, চাকরের কাছেও নয়। তখন ঠাকুরের খোঁজ পড়িল। থানার হাতায় তাহাকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে লোক ছুটিল, সেখানেও নাই। রিপোর্ট পাওয়া গেল, তাহাকে নদীর ঘাটে দু'একজন দেখিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, জলের ধারে কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া, পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সাবানের গাঢ় ফেণায় আবৃত করিয়া ঠাকুর অসীম পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে গাত্রচর্ম সংস্করণে ব্যস্ত, পাশে বালির উপর, হলদে রং-এ ছোবান দুইখানা নূতন কাপড় শুকাইতেছে।

বসন্ত কোন অনিবার্য কারণে দিনমানে আর আসিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া বধূর নিকট গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তের কথা শুনিয়া এবং কিছু প্রমাণও চাক্ষুষ করিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, "সর্বনাশ করেছ বৌ! সে ব্যাটাকে নতুন কাপড় দিতে গেলে কেন?"

হিরণ কতকটা অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন বল তো?"

বসন্ত উত্তর না দিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কাপড় দুটো চুবিয়েছিল কিনা বলতে পার ?"

হিরণ বিস্মিতভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, হলদে রং-এ।"

বসন্ত হতাশভাবে এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "ব্যস্. তাহ'লে যা' ভয় করেছি তাই হয়ে বসে আছে নিশ্চয়। নতুন কাপড় পেলেই সে তাড়াতাড়ি চুবিয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি পালায়। কত কাণ্ড করে তাকে আটকে রাখি, দোকানে পর্যন্ত তাকে কাপড় বেচা মানা। এখন করা যায় কি ? তাও কি সেখানে লোক পাঠিয়েই তাকে পাওয়া যাবে ? দুটো জেলার মধ্যে শ্বশুর বাড়ির সংক্রান্ত যে যেখানে আছে লুকিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করে বেড়াবে,—দু'মাসের ধাক্কা ; ওর চেয়ে দাগি চোরকে টেনে বার করা ঢের সহজ। আমি তিনবার ঘা খেয়ে খেয়ে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে কোন রকমে এই বছরখানেক আটকে রেখেছিলাম। আর তুমি ?"

হিরণ প্রথমটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী তাহার ত্রুটিটুকু লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া এবং একবার আস্কারা পাইলে আরও বাড়াবাড়ি করিবে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "ঠাকুর গেলে কি জলে পড়বে ? আমি না হয় নেহাৎ অকর্মণ্য,—তোমার রান্নাঘর মাড়াবার যুগ্যিও নই ; কিন্তু একমুঠো চালও ফুটিয়ে দিতে পারব না ? তাতে দুটো আলুভাতে ফেলে দিতে পারব না ? আমি পাড়াগেঁয়ে জংলী ; ভাল তরকারিটা-আসটা না হয় নাই রাঁধতে পারলাম, কিন্তু…"

কথাবার্তা উল্টা দিকে যায় দেখিয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি বলিল, "বাঃ, তাই কি বললাম ?—ভাল রাঁধতে পার না ? কাল রাত্রে ডালনা যা রেঁধেছিল ! একটু নুন কম হওয়া সত্ত্বেও সে কী সুন্দর হয়েছিল ! যদি নুনটা ঠিক একটু মাপসই হ'ত তো না জানি…"

হিরণকে একভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গেল।

হিরণ শান্তকণ্ঠে বলিল, "নুন কম হয়েছিল, কৈ কাল তো বল নি। ঐটেরই তো বেশি প্রশংসা করলে।"

বসন্ত আমতা আমতা করিয়া বলিল, "প্রশংসা না করে উপায় ছিল? জিনিষ যা দাঁড়িয়েছিল, অতি বড় শত্রুও প্রশংসা না করে...আর নুন কম মানে— নেহাৎ যেন একটু—মনের সন্দেহও হ'তে পারে..."

হিরণ সেইরূপেই শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি অপরাধটা করেছি যে শুধু সন্দেহের ওপর রান্নার এই অপবাদটা দেওয়া হ'ল?"

বসন্ত আরও ঘাবড়াইয়া গেল। কি বলিলে সামলান যায় স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই দেখ! অপবাদ দোব কেন? আর অপরাধের কথা যে বল্‌ছ, অপরাধ তো আমারই, আমি যে একটু বেশি নুন খাই—একটা রোগ আমার..."

"বলেছ আমায় সে-কথা এর আগে? নুন একটু বেশি দেওয়া খুব শক্ত—না, জিনিসটা বড় মাগ্যি?"

বসন্ত অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া যেন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বলিল, "মনে হ'ল একবার বলি, কিন্তু আবার ভাবলাম রোগটা যদি এইভাবে একটু একটু করে সেরে আসে তো..."

হিরণ একটু নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "থামো বাপু, একে আমার মাথার ঠিক নেই!"

ঠাকুর সত্য সত্যই নূতন কাপড়ের জয়পতাকা উড়াইয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। হিরণ নূতন পাচক আনিতে দিল না। রান্নাঘরের অসপত্ন চার্জ গ্রহণ করিয়া স্বামীর দেহচর্য্যায় পূর্ণ উৎসাহে লাগিয়া গেল।

বিশেষজ্ঞেরা যাহাই বলুন না কেন গবর্ণমেণ্ট নুন জিনিষটাকে এখনও প্রয়োজনমত মহার্ঘ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন বিশেষ আইন

করিয়া যদি একেবারেই জিনিষটাকে দেশছাড়া করিয়া লওয়া হয়—অন্তত কিছুদিনের জন্য, তো বসন্ত খুব কৃতজ্ঞ হয়। একবার নুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করিয়া সে আর কথাটা ফিরাইতে পারিল না এবং উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে নুন খাইয়া বধূর রান্নার অপ্রশংসা করিয়া নিমকহারামিও করিতে পারিল না। যাহোক পাড়াগাঁয়ের প্রচুর টাটকা মাছ আর খাঁটি ঘি দুধের জোরে দারোগাগিরির হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও হিরণের প্রাণান্তকর পরিচর্যার মধ্যেও শরীরটা কোন রকমে খাড়া করিয়া রাখিল। কিন্তু রহস্যপ্রিয় বিধাতার বোধ হয় সেইটুকুও সহ্য হইল না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হিরণের মনটা সাধারণভাবে এ দেশের লোকের উপর সন্দিগ্ধ—তাহার বাপের বাড়ির লোকের তরফ হইতে ট্রেনিং-ই ঐ ধরণের। বসন্তর শরীর যে ভাঙিয়াছে এটা অবশ্য হিন্দু স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইল না। তখন সে একটু চিন্তিত হইল। রান্নার তো কোন রকমই ত্রুটি নাই, স্বামী রোজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিতেছে, অথচ এ-রকমটি হইতেছে কেন? হিরণ একদিন সমস্ত-রাত গভীরভাবে ব্যাপারটা অনুধাবন করিল, তাহার পর তাহার মনে হইল যেন রহস্যটা ধরা পড়িয়াছে।

পরের দিন মাছওয়ালী মাছ দিতে আসিতে হিরণ নিজেই গিয়া সামনে দাঁড়াইল। মাছের কান্‌কা আঁশ সব উল্টাইয়া দেখিয়া পরম বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইয়া বলিল, "হুঁ, বুঝেছি, তুই হারামজাদি রোজ পচা মাছ দিয়ে যাস্‌, তাই বাবু মুখে দিতে পারেন না, রোস।"

মেছুনী যেন আকাশ হইতে পড়িল, তাহার ভোরের ধরা মাছ, তাড়াতাড়ি দারোগাবাবুর বাড়ি জোগান দিতে আসিয়াছে। দুই হাত তুলিয়া, বুক চাপড়াইয়া, আঁখকে কিরা, গঙ্গাজীকে শপথ খাইয়া সহস্রভাবে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। শেষে মাছের কান্‌কোর মধ্যে হাতটা চালাইয়া দিয়া খানিকটা টাটকা রক্ত বাহির করিয়া

মাটির উপর ফেলিয়া বলিল, "এই দেখুন মাইজী, একেবারে টাটকা খুন, পচার কথা ছেড়ে দিন, একটু বাসি হ'লেও কি এ জিনিস পাওয়া যেত ?"

হিরণ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল, তাহার পর তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "দেখ্, আমি খাস বাংলাদেশের মেয়ে, তোদের কারচুপিতে তোদের দারোগাবাবু ভুললেও আমি ভোলবার পাত্রী নই, তোদের জাতকে আমাদের দেশে ঢের দেখেছি, কি করে গেরস্তর চোখে তোরা ধুলো দিস তা যদি আমার জানা না থাকত তো আর এখানে আসতাম না। বলি, ওটা তোর মাছের রক্ত, না ?—এইটে আমায় বিশ্বাস করতে হবে ?"

মেছুনী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একটু সংবিৎ হইলে বলিল, "মাছের রক্ত নয়-তো কি মাইজী ?"

"মাছের রক্ত ?—বাসি পচা মাছ সব ফেলে দিয়ে, টাটকা মাছ বেচবি সেই রকম বোকা জাত কিনা তোরা! এখানকার বাজারে লাল খুনখারাবি রং আসে না ? কিছু জানি না আমি, না ?"

মাগীটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হিরণ বলিল, "তুই বল্‌দিকিন আমার পা ছুঁয়ে, রং গুলে, আর হড়হড়ে করবার জন্যে একরত্তি ফেনের সঙ্গে মিশিয়ে কান্‌কোর মধ্যে দিয়ে বাসি মাছ নিয়ে আসিস নি ? বল, যে মাছটা সন্ধ্যে পর্যন্ত বিকোয় না, সেটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাস,—সেই লোকসানটা গা পেতে নিস্ ? বল না ? আ মর্! মাছ না হ'লে দারোগাবাবুর চলে না, বেশি নুন, ঝাল দিয়ে রেঁধে দিচ্ছি আজ, কিন্তু ফের যদি কখন কান্‌কোর মধ্যে রং ঢেলে আমায় ভোলাতে আসিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

মেছুনী আবার হাজার রকম ভাবে শপথ করিল, কিন্তু কেহ যদি লক্ষ্য করিবার থাকিত তো স্পষ্টই বুঝিতে পারিত—মাছ দিয়া যাইবার সময় সে

একটু চিন্তিত ভাবে যাইতেছে, মাথার মধ্যে একটা নূতন ধারণা খেলিতেছে যেন।

দু'চারদিন ভাল অর্থাৎ পূর্ব্বের মতই মাছ পৌঁছিল, তাহার পর বসন্ত একদিন খাইবার সময় হাতটা একটু গুটাইয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁগা, মাছটা একটু দোরসা বলে বোধ হচ্ছে যেন।"

হিরণ পাখা করিতেছিল, হাতটা থামাইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠিক এই কথাই এবার শুনব তা' জানতাম। যদ্দিন পচা দোরসা মাছ মাগী দিয়ে গেছে তদ্দিন তো মুখে একটি কথা ছিল না, আমি যেই তা'র বজ্জাতি হাতে নাতে ধরে টাটকা মাছের বন্দোবস্ত করলাম, অমনি তুমি দোরসা মাছের গন্ধ পেলে। দেখ, আমারও নাক আছে চোখ আছে, নিজে কিনে, নিজের সামনে কুটিয়ে, নিজের হাতে রেঁধেছি, দোরসা হ'লে ধরা পড়তই, পাতেও দিতাম না; শত্রু নয় তো। আর যদি এতই অপদার্থ মনে কর, এতই অবিশ্বাস, আনিয়ে নাও না বাপু তোমার ঠাকুরকে। মাকে লিখে দিই, নিয়ে যাক আমায়। কেন মিছামিছি একটা অপযশ...."

বসন্ত তাড়াতাড়ি সস্নেহে মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিল, "না, আমার যেন একটু সন্দেহ হচ্ছিল—সামান্য একটু, তা' সন্দেহের উপর তো একটা অপবাদ দেওয়া যায় না! আর ঠাকুর?—তোমার হাতের রান্নার পর আর সে ব্যাটার সে পোড়া-ধরা রান্না কি খাওয়া যাবে? তা'কে তো সরিয়েই দেব ভাবছি এবার..."

রান্না কোন দিন আলুনি হয় না, মাছও শোধরাইয়াছে, স্বামীর শরীরের কিন্তু উন্নতি দেখা যায় না, বরং উত্তরোত্তর যেন খারপই হইতেছে। দুশ্চিন্তায় আবার হিরণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দোষটা যে কাঁচা আহার্য দ্রব্যের মধ্যে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা এদিকে তো পান হইতে চুণটি খসিতে দেয় না সে।

গয়লানী আসিয়াছে, উঠানে বসিয়া ঝিয়ের সামনে দুধ মাপিয়া

দিতেছে। কেঁড়ে হইতে গাইয়ের দুধের ঈষৎ হরিদ্রাভ টাটকা ধারা পিতলের মেছলিতে জমা হইতেছে।

হিরণের চোখটা একবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া গিয়া বলিল, "দাঁড়া, ঠিক গাইয়ের দুধ দিচ্ছিস তো?"

গয়লানী কেঁড়েটা মাটিতে রাখিয়া বিনীতভাবে বলিল, "দারোগাবাবু গাই দুধের কম রেটে দুধ নিচ্ছেন আর আমি মহিষের দুধ দিয়ে অধর্ম করব মাইজী? বেটাপুৎ স্বামী নিয়ে ঘর করছি..."

হিরণ বিরক্তভাবে মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, "নে বাপু আমায় আর তোদের জাতের ধর্ম দেখাস নি,—কথায় বলে গয়লার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে। ফেল্ তো মাটিতে দু'ফোঁটা দুধ দেখি।"

দু'টা আঙুল দুধে ডুবাইয়া গয়লানী মাটির একটু উপরে ধরিল। গাঢ় স্নিগ্ধ গুটিকতক দুধের ফোঁটা উঠানের সানের উপর টলটল করিতে লাগিল।

হিরণ একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কখনও গরুর দুধ নয় তোর, তা' ভিন্ন খাঁটিও নয়, টাটকাও নয়। এতদিনে ঠিক ধরেছি, চিরকাল গাই দুধ খাওয়া অভ্যেস, তার জায়গায় মোষের মাঠা-তোলা তে-বাষ্টে দুধ খেয়েই দিন দিন দারোগাবাবুর শরীর পাত হয়ে যাচ্ছে।"

একে দুধটা খাঁটি বলিয়া অপবাদটা যথার্থই গায়ে লাগে, তাহার উপর দারোগাবাবুর ভয়। গয়লানী বুক চাপড়াইয়া, কপাল পিটিয়া স্বামী-পুত্র, গঙ্গা-মাই, সলেশবাবা, শীৎলামাই-এর শপথ খাইয়া নানাভাবে নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সব বৃথা। হিরণ এই সমস্তর মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিল, "দেখ, আমি দেশের মেয়ে; বাড়ির পাশে গয়লাপাড়া, আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই। না হয় যা বলছি মিলিয়ে দেখ।"

হিরণ অভিজ্ঞতার গর্বের সহিত হাতের তর্জনিটা তুলিয়া বলিল, "সেরে

এক পো জল, গেরস্তর বাবারও সাধ্যি নেই ধরে—এক ল্যাক্টোমিটার ছাড়া....”

গয়লানী শিহরিয়া উঠিয়া চোখ দুইটা হাতে চাপিয়া শপথ করিল, “হে মাইজী, আঁখ গল্ যায়।”

“রাত্তিরে জ্বাল দিয়ে সরটা তুলে নিস্। মোষের দুধ গরুর দুধের মত পাৎলা হ’ল, তারপর একটু কাঁচা মাখন আবার মিশিয়ে আর একবার জ্বাল দিয়ে....”

“হে মাইজী, এ সব কিছু জানিও না সাত জন্মে। দোহাই ধর্মের, গরুর বাঁটের টাটকা-দোহা দুধ—রং দেখুন—মোষের দুধ তো শাদা হবে?”

হিরণ অনেকটা ভ্যাংচাইয়া বলিল, “শাদা হবে! এতই বোকা দারোগাবাবুর বউ, না? তোদের দেশে হলুদ নেই তো’! হলুদ বেটে, পুরু কাপড়ে তার রস নিংড়ে তোমরা দাও না তো দুধে। মাইজী তো কিছু জানে না! চালাকি করতে আর জায়গা পাও নি? গাইয়ের দুধের ডবল দাম, উনি সেই দুধে ঘি না করে বাবুকে নিত্যি জোগান দিচ্ছেন! বড় সোহাগ কি না ...। বাবুকে এতদিন যা’ ঠকিয়েছিস্ ঠকিয়েছিস্; মনে রাখিস্ এবার শক্ত লোকের পাল্লা...”

আর দুই তিন দিন দুধটা ভালোই অর্থাৎ পূর্ববৎই আসিল। খুব সম্ভব গয়লাবাড়িতে হিরণের ফরমুলা লইয়া গবেষণা চলিল এ-কটা দিন। তাহার পর একদিন দুধের বাটিতে একটু চুমুক দিয়াই ধীরে ধীরে বাটিটা নামাইয়া বসন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, “হ্যাঁ গা, যেন হলুদ হলুদ গন্ধ বেরুচ্ছে দুধটাতে।”

হিরণ ইহার জন্য যেন প্রস্তুতই ছিল, কিছু না বলিয়া পাখা নামাইয়া ডাকিল, “দাই।”

ঝি আসিলে বলিল, “তোদের দারোগাবাবু দুধে হলুদের গন্ধ পাচ্ছেন।”

ঝি স্বভাবতই একটু সাহসিকা, তাহার উপর ক্রমাগতই পরিষ্কার থাকিবার নানা রকম দ্রব্যসম্ভার পাইয়া একেবারেই কর্ত্রীর অন্তরঙ্গ



...যেন হলুদ হলুদ গন্ধ...

এবং তাহার ফলে আরও বেশিরকম সাহসিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টপ করিয়া দুয়ারের আড়াল হইয়া হাসিতে লুটপুট হইয়া বলিল, "গে মাই! আইকাল আর কাঁহা হরদি ফোঁটেইছেই?" (মা!—আজকাল আর হলুদ কৈ মেশায়?)

"নে থাম্, তোকে আর হাসতে হবে না হারামজাদী, আমার এদিকে পিত্তি জলে যাচ্ছে রোজ রোজ কচি ছেলের মত বায়নাক্কা দেখে দেখে"—ঝিয়ের ঔদ্ধত্যের জন্য এইটুকু মৌখিক ধমক দিয়া হিরণ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দেখ, দাইও বলছে আজকাল আর হলুদ মেশায় না, তার মানে আগে মেশাত। ছোটলোক হলেও, মেয়েমানুষ হলেও ওর তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে। যদ্দিন ছিল দুধে হলুদের গন্ধ, তদ্দিন পেলে না; যেই একটু বুদ্ধি করে ধরে সেটা বন্ধ করলাম…বলছ, না হয় দেব'খন মাগীকে আর একবার চুমড়ে, কিন্তু তোমার সেই চিরকেলে হাড়-জ্বালান সন্দেহ নয় তো?"

নিজের মুখেই এতবার মনের সন্দেহের দোহাই দিয়াছে যে সেটাকে আর অস্বীকার করা যায় না। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসন্ত ধীরে ধীরে দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিল। তাহার পর আটকান নিঃশ্বাসটা খুব জোরে নামিয়া পড়ায়, ধড়া পড়িয়া যাইবার ভয়ে একটা তৃপ্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "নাঃ, তোমার কথাই ঠিক, মনের সন্দেহই ছিল দেখছি,—ঠাউরে ঠাউরে খেয়ে দেখলাম কিনা। যাক্, মিটে গেল।"

মাছ গেল, দুধ গেল, দু'দিন পরে ঘি-ও নষ্ট হইল। ঘিয়ের গয়লানী মাইজীর গালমন্দর ভিতর দিয়া টের পাইল সহরে ভেজিটেবল্ ঘি বলিয়া ঘিয়ের এক স্বজাতি দেখা দিয়াছে, ভেজাল দিলে দুনো লাভ বাঁধা। তাহার 'পুরুষ'কে দিয়া দশক্রোশ দূর হইতে একটিন সংগ্রহ করিল এবং অল্পে অল্পে জোগান দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ককে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

ওদিকে মেছুনীর কাঁসার চুড়ির মাঝে এক এক জোড়া করিয়া রূপার চুড়ি উঠিয়াছে, দুধের গয়লানীর গা হইতে কাঁসার বালা একেবারেই নির্বাসিত হইয়াছে; এখন বেসাতি করিবার সময় তাহারা বাংলাদেশের মেছুনী গয়লানীর মতই হাতমুখ খেলাইয়া, গয়না চমকাইয়া বেসাতি করে। সমস্ত গ্রামটা ভেজালে ভরিয়া গিয়াছে, আশপাশের গ্রামেও সুরু হইয়াছে। বসন্ত গৃহে নিরীহ হইলেও বাহিরে উগ্র, এদিকে উগ্রতাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে বরং। জরিমানা করিল, বেটা-ছেলেদের ডাকিয়া মারধোর করিল, শেষে ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখাইল। কিছু ফল হইল না। হিরণের শিষ্যরা মাইজীর কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িল।

হিরণ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁগা, তোমার আক্কেলটা কিরকম শুনি? যদ্দিন ঠকিয়ে এসেছে তদ্দিন তো মুখ বুজে সয়ে গেলে। এখন নিরীহ বেচারীদের উস্তম ফুস্তম করছ কেন বল দিকিন? একে তো যত আঁকুপাঁকু বাড়ছে ততই শরীর কালি হয়ে যাচ্চে ওদিকে, তার ওপর নির্দোষীদের শাপমন্যি খেয়ে একটা কাণ্ড ঘটুক, কথায় কথায় হাত উঁচু করে—দক্ষিণ-মুখো হয়ে যেমন সব গঙ্গার দিব্যি, সন্দেশ ঠাকুরের দিব্যি খায়—আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। রোজ পুরুৎ জ্যোৎখীজীর হাত দিয়ে পাঁচসিকে করে পুজো পাঠিয়ে কোন রকমে কাটিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে আছে অদৃষ্টে...."
হাতে করিয়া আঁচল ধরিয়া তুলিল।

বসন্ত বুদ্ধি করিয়া কিছুদিন ছুটির দরখাস্ত দিয়া দিয়াছিল; দুইমাস পরে বাড়ি আসিয়াছে।

মিত্র-গৃহিণী ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের কথাবার্তা অনেকটা আগাইয়া

আনিয়াছেন ; এখন হিরণের সাহায্যটাও কাজে লাগাইতে হইবে, কেননা, পয়মন্ত বলিয়া সে শ্বশুর-শাশুড়ীর বড় প্রিয়পাত্রী।

সবাই বসিয়াছিলেন, এমন সময় বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া সদরের দিকে চলিয়া গেল। মিত্র-গৃহিণী হিরণের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "তা' বলতে নেই,—এ ক'টা দিনেই বসন্তর আমাদের শরীরটা যেন একটু···তা' হবে না গা ? বৌদিদির নিজের পছন্দ করা মেয়ে···"

বসন্তর মা বসন্ত মোটা হইয়াছে এটা ধরিয়া লইয়াছেন। মায়ের নজর নাকি বড় খারাপ, সেইজন্য অকল্যাণের ভয়ে এখনও পুত্রকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। মিত্র-গৃহিণীর উভয়স্পর্শী প্রশংসায় সম্প্রীতির সহিত বলিলেন, "তা সেয়ানা আছে বাপু তোমাদের বৌ, বলছিল কিনা—বলে—মা, কী ভেজালের দেশ !—মাছ, দুধ, ঘি, তেল—সবতাতেই কী ভেজালের ছিষ্টি !—শোধরাতে কি কম কাণ্ডটা করতে হয়েছে ?····না, তা বলতে নেই, সেয়ানা আছে···কৈ গো, কাশী থেকে যে জর্দাটা এসেছে, তোমার পিস্‌শাশুড়ীতে একটু দাও না বৌমা···"

বুড়াশিব ডে

[১]

রাস্তাটা দত্তদের পুকুরের ধারে ধারে খানিকটা দক্ষিণে গিয়া পূর্বে ঘুরিয়াছে এবং সেখান হইতে সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছে। এই মোড়ের মাথায় বুড়াশিবের মন্দির। বলা হয় মন্দির বটে, কিন্তু আশ্রয়টি সে জাতীয় কিছুই নয়। ঠিক রাস্তার পাশেই প্রায় বুক পর্যন্ত উঁচু, ফালির মত একটু রক, তাহার পরই ছোট্ট একটি চতুষ্কোণ ঘর। ছাতের সামনের অর্ধেকটা কবে পড়িয়া গিয়াছে, পিছনের অর্ধেকটা একটা বৃদ্ধ বট নিজের শিরা-উপশিরার জটিল গ্রন্থি দিয়া কোন রকমে ধরিয়া আছে। মা-গঙ্গা যখন আকাশ বাহিয়া চলেন, তাঁহার কায়েমী আশ্রয় শিবের-মাথায় নামিয়া আসিতে কোন বাধাই থাকে না।

মূর্তিটা কালো পাথরের, কিন্তু এত জায়গায় ভাঙা ঘষা যে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কোন্ দেবতার মূর্তি বলা কঠিন। বেদীর পাশেই একটি শ্বেতপাথরের বৃষ বসান থাকায় বিগ্রহটীকে শিবমূর্তি জ্ঞানেই পূজা করা হয়। ডেঁপো ছেলেরা বলে ওটা বাবার সার্টিফিকেট।

ঠিক পূজা হয় বলিলেও ভুল হয়। যাহারা এই পথ দিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যায়, ফিরিবার সময় এক ঘটি জল ঢালিয়া একটা প্রণাম করিয়া যায়। পূর্বে দু'-একখানা করিয়া বাতাসা পড়িত, সম্প্রতি পাশের বাড়ির ছেলেটা বড় হইয়া বেজায় দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাতাসা পড়িতেই সে আসিয়া অভিভাবকহীন ঠাকুরের উপর অনাচার লাগায় বলিয়া ঠাকুরের সেটুকু সুখও গিয়াছে—ভূতনাথের উপর ভূতের উপদ্রব আর কি!

এই ঠাকুর ; লোকে যে পূজা করে তাহার মধ্যে ভক্তির চেয়ে দয়ার ভাগই থাকে বেশি,—"আহা, কেউ তোমার দেখবার নেই বাবা ; একরত্তি যে মিষ্টি দেবে লোকে, সেও ভোগে লাগবে না দস্যি ছেলেদের জ্বালায়...”

এ-হেন ঠাকুরের কাছে কোন প্রার্থনা করা সহজে কল্পনায় আসে না।

তবু একজন করে, নিত্য আর নিরুপায়ের পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। সে দুর্গাচরণের বৃদ্ধা মাতা।

দুর্গাচরণের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, এখনও ছেলেপিলে হয় নাই। স্ত্রীর বয়স চব্বিশের উপর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, প্রথম পক্ষেরটি বাঁচিয়া থাকিলে প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশের কাছাকাছি হইত।...মোট কথা সন্তানাদির আর আশা নাই।

মা জাহ্নবী দেবী অনেক চেষ্টা করিলেন।—জলপড়া, কবচ, মাদুলি, সাধু সন্ন্যাসী, পীর, ফকির—কিছুই বাকি রহিল না। বধূটিকে লইয়া অনেক তীর্থ পর্যটনও করিলেন। শেষে শরীর যখন জবাব দিল, সমস্ত চেষ্টা তাঁহার বুড়াশিবের মাথায় এক ঘটি করিয়া জল ঢালায় আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলেন, "বাবা, তোমায় ছেড়ে রাজ্যি ঘুরে বেড়ালাম, সেই অপরাধেই কি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করলে না! সাজা তো হ'ল, এখন দেখ একটু মুখ তুলে, বউয়ের কোলে দাও একটি গুড়োগাঁড়া যা হয়...”

সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতি হোমরা-চোমরাদের বধিরত্ব হেতু কখন কখন যেমন চাকরির জন্য খোসামোদ করিয়া লোকে নগণ্য ছোটবাবুকেই আকাশে তোলে, এও সেই রকম হইল।

অভ্যাসের জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক, ক্রমেই এই মূর্তির উপর মনের যত ভক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পর গুটিকতক বাতাসা। পাছে অনাচার হয়, সেই ভয়ে বৃদ্ধা পাড়ার আতঙ্ক সেই ছেলেটিকে পূর্বাহ্নেই ডাকিয়া লইতেন এবং উৎসর্গীকৃত বাতাসাগুলি

কুড়াইয়া লইয়া সতর্কভাবে তাহার হাতে তুলিয়া দিতেন। ক্রমে ছেলেটিকে আর ডাকিতে হইত না এবং এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তাহার উপর হইতে আতঙ্কের ভাবটি কাটিয়া গিয়া তাহাকে পূজার যেন একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; অর্থাৎ সে পূজার দেবতার গোষ্ঠীভূত হইয়া উঠিল এবং তাহার জায়গাটা হইল শিবঠাকুর এবং বৃষের মাঝামাঝি; নন্দী-ভৃঙ্গীর সামিল বলিলে ভুল হয় না।

ক্রমশ, সন্তানপ্রার্থিনীর পরের সন্তানের উপর যে একটা সহজ টান বা স্নেহ থাকে, সেটুকুও আসিয়া ছেলেটিকে আরও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিল।

কিছুদিন এইভাবে গেল।

তাহার পর বৃদ্ধা একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিন দিন ঠাকুরের ফুলজল-বাতাসা বন্ধ রহিল। বধূটি স্নান করিয়া ফিরিবার সময় রকে টুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে। ঠাকুরের কাছে গিয়া অত করিয়া পূজা দিতে লজ্জা করে; কেমন যেন মনে হয়, ঠাকুর মনের আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্টভাবে দেখিয়া ফেলিবেন। আর সবার কাছে লুকান যায়, তাঁহার কাছে তো লুকাইবার যো নাই।

চতুর্থ দিনে বৃদ্ধা ভোরের পূর্বেই ঘুম হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। বধূকে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া তাহার পিঠে হাতটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বধূ প্রশ্ন করিল, "কেমন আছ মা, ডাকছিলে কেন?"

"বলছি....বৌমা, ঠাকুরকে এ-দু'দিন বাতাসা দেওয়া হয় নি, না?"

বধূ মাথাটি নিচু করিয়া রহিল।

"পাগলী মেয়ে....বলতে কি সরছে মা যে, বলব?—কি সব গোলমেলে ব্যাপার—যেন কতদূর থেকে ঘুরে ফিরে এসেছি, বুড়োবাবার মন্দিরের সামনে এসে পা এত ভেরে গেল যে, আর চলতে পারি না। রকটিতে উঠে বসব এমন সময়···বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে বৌমা···বসব, এমন সময় হঠাৎ ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখি ঠাকুর নেই। মনটা আতালি

পাতালি করে উঠল—ওমা, একি কাণ্ড! এমন সময় হঠাৎ দেখি সেই দুরন্ত ছেলেটি যেন লাফাতে লাফাতে উঠে এল। জিগ্যেস করলাম,



তোর বাতাসা খেতে এলাম....

"হ্যাঁরে খোকা, ঠাকুর কোথায় গেলেন বলতে পারিস দাদা!" ছেলেটা বললে, 'তা বুঝি জান না? তিনদিন বাতাসা না পেয়ে তিনি যে

তোমাদের বাড়িই গেছেন ; তিন দিন ঠায় উপোস করিয়ে রেখেছিলে যে তুমি'…'আমাদের বাড়ি ? আর আমি পোড়াকপালী রাজ্যি ঘুরে মরছি !'—বলে তাড়াতাড়ি উঠব এমন সময় দেখি…"

বৃদ্ধার গলাটা কাঁপিয়া উঠিল, বলিলেন, "আমার কি সে রকম অদেষ্ট হবে বৌমা ? কেন যে মিছে আশা দিচ্ছেন…"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "দেখি তুমি হন হন্ করে মন্দিরের পানে চলে আসছ, কোলে—সে যে কী অপূর্ব মূর্ত্তি ছেলের, কি বলব বৌমা, চোখে যেন এখন পর্য্যন্ত লেগে রয়েছে !….দেখেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—'তোর বাতাসা খেতে এলাম, মন্দিরে পড়ে থাকলে তুই ভুলে যাস কি না' · ছ্যাঁৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল।"

শাশুড়ী বৌয়ে দুজনেই অভিভূত ভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বৃদ্ধা সজল চক্ষু দুইটি বধূর মুখের উপর রাখিয়া ব্যাকুল প্রশ্নে বলিলেন, "কাঙালের সঙ্গে সত্যিই কি ঠাকুর ঠাট্টা করলেন বৌমা ?"

[২]

যদি মানা যায় যে, এই স্বপ্ন-ব্যাপারে বুড়াশিবের কিছু হাত ছিল তো তাঁহার যে ঠাট্টা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, জাহ্নবী দেবী এটা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। বৎসর না ঘুরিতেই বধূর শূন্য কোল পূর্ণ করিয়া একটি পুত্র সন্তান হইল। বুড়োশিব নিজেই আসিয়াছেন বলিয়া নাম হইল গৌরীনাথ।

পূর্ববর্ণিত সমস্ত ঘটনাই প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার ব্যাপার। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। জাহ্নবী দেবী নাই। গৌরীনাথের মা সাবিত্রী দেবী, এখন প্রায় পঞ্চান্ন বৎসরের প্রৌঢ়া, অনেকটা শাশুড়ীর জায়গা লইয়া বুড়াশিবের মাথায় জল, বিল্বপত্র, বাতাসা চড়াইতেছেন ; ব্যবধান

এইটুকু যে জাহ্নবী দেবীর ছিল নাতির আকাঙ্ক্ষা, সাবিত্রীদেবীর আরও প্রাথমিক ব্যাপার, অর্থাৎ পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, অবশ্য এই ব্যাকুলতার অন্তরালে যে একটি কাল্পনিক শিশু ঘুরিয়া বেড়ায় না, সে-ই বা কে বলিবে ?

গৌরীনাথ ইতিহাসে এম-এ, পাশ করিল, এখন গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে একটি ভাল চাকরী করিতেছে এবং উগ্ররকম রিসার্চে ডুবিয়া আছে। রিসার্চের সুবিধার জন্যই বালিগঞ্জে একটি ছোট্ট বাড়ী লইয়া একলাই থাকে, সাবিত্রী দেবী বলিয়াছেন, তিনি শেষ বয়সে গঙ্গা আর বুড়াশিব ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারিবেন না।

গৌরীনাথ কচিৎ-কখন আসে দেশে, না হইলে চাকরির অতিরিক্ত সময়টা মিউজিয়াম, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী কিংবা সাহিত্যপরিষদে কাটাইয়া দেয়।

দেশে, পাড়ার বর্ষীয়সীরা বলে, "ইটপাথর নিয়েই কি কাটাবে ছেলে, গৌরীর মা ?—বিয়ে থা দাও !"

বিয়ের কথায় দুঃখ হয়, তবুও সাবিত্রী দেবী বুড়াশিবের রকে মাথা নোয়াইয়া বলেন, "অপরাধ নিও না বাবা, ইটপাথরের মর্যাদা আমি তো বুঝি, যাতে তোমার তৃপ্তি তুমি তাই নিয়ে থাক। সন্তান হয়ে এসেছ, কি যে ভয়ে ভয়ে থাকি তা তুমিই জান।"

বাবা প্রস্তররূপে বৃদ্ধার আকুতি শুনিয়া কি ভাবিতেন বলা যায় না, তবে সন্তানরূপে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন, যাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই দুর্জ্ঞেয়।

গৌরীনাথের এবারে প্লান ছিল শিবরাত্রি উপলক্ষে নেপালে গিয়া পশুপতিনাথ এবং আশেপাশে আর যা মূর্ত্তি-বিগ্রহ আছে সে সব সম্বন্ধে গবেষণা করিবে ; কিন্তু মা চিঠির উপর চিঠি দিয়া, লোক পাঠাইয়া, শপথ দিয়া এমনি করিয়া তুলিলেন যে, সে আর হইয়া উঠিল না। বাড়ি

আসিলে সাবিত্রী দেবী বলিলেন, "বাবা, সেবারে ও-রকম অসুখে পড়লি, বুড়াশিবের কাছে মানত করলাম, তোকে দিয়ে শিবরাত্রির দিন হাজার বিল্বপত্র চড়াব ; আজ সন্ধ্যেয় আমার সঙ্গে শিবতলায় যাবি একবার....না রে না, তোকে উপোস করতে হবে না, ভয় নেই , তুই উপোসে কত বাহাদুর সে ঠাকুর নিজেই বোঝেন।"

মনে মনে বলিলেন, "তুমি উপোস করে থাকলে কি ঠাকুরের পেটে জলবিন্দুও পড়বে ? কত ছলনাই যে জান !"

সন্ধ্যার পর মার নির্বন্ধাতিশয্যে গৌরীনাথ গিয়া বুড়াশিবের মাথায় বিল্বপত্রগুলি ঢালিয়া দিল। ভক্তির বালাই নাই, মূর্তির গঠন দেখিয়া তাহার মধ্যকার প্রত্নতাত্ত্বিকটি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোয় এবং ফুল-বিল্বপত্রের অন্তরালে যতটা সম্ভব মূর্তিটা পরীক্ষা করিল ; এতদিন, নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই এই শিলাপিণ্ডটির এবং জীর্ণ প্রাচীর কয়টির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। মা যতক্ষণ পূজা করিলেন আশেপাশে, কোণে-কাণে ঘুরিয়া মন্দিরের কঙ্কালটুকু, কয়েকটা শিলালিপি, দেয়াল গাঁথা দুইটি ক্ষুদ্র মূর্তি—সব পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সাবিত্রী দেবী উঠিয়া বলিলেন, "ওরে গৌরী, অন্ধকারে কোণেকানে অমন করে ঘুরিস নি বাবা, আজ শিবরাত্রি। তোর কি কিছুতেই ভয় নেই হ্যাঁরে ?" বলার ভঙ্গীতে যথেষ্ট উদ্বেগ তো ছিলই, কোথায় যেন একটু গর্ব, একটু নিশ্চিন্ততাও লাগিয়াছিল।—এ কি সাধারণ ছেলে যে ভয় থাকিবে এর ?

গৌরীনাথ একটু যেন চিন্তিতভাবে বাড়ী আসিল। আহার করিবার সময় সাবিত্রী দেবীকে বলিল, "মা, শিবঠাকুর বলে তো দিব্যি জল ঢেলে আসছ ; ঠাকুরমাও বোধ ঐ করে ফাঁকি দিয়ে শিবলোকে গেলেন চলে। কিন্তু, ঠাকুর তো তোমার শিব নয়—শিবের ধার দিয়েও যান না ; ও যে ডাহা বুদ্ধদেব দেখছি।"

সাবিত্রী দেবী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। মালাজপ বন্ধ করিয়া

তাড়াতাড়ি বলিলেন, "চুপ কর্ গৌরী, তোদের মুখে কি কিছুই আটকায় না ; 'শিব শিব'।—আজ কত যুগ থেকে বাবা পুজো নিয়ে আসছেন, সাতটা গাঁয়ের জাগ্রত ঠাকুর, আর তুমি কিনা···দেখ দিকিন, কী অমুঙ্গুলে কথা এই শিবরাত্রির দিন····না বাপু।···"

গৌরীনাথ হাসিয়া বলিল, "এ যে তোমার অন্যায় কথা মা ; অনেক দিন থেকে লোকে ভুল করে পুজো দিয়ে আসছে বলে বুদ্ধদেব শিব হয়ে যাবেন ? এ ভেল্কি আর যে বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু ইতিহাস বিশ্বাস করবে কেন মা ?"

বৃদ্ধা অস্থির হইয়া বলিলেন, "তুই চুপ কর্ গৌরী। কে তোর ইতিহাস জানি না ; কিন্তু ধর্মের সে কি বোঝে রে ? আরে গেল ! বাবা কত বাঁজাকে ছেলে দিলেন, স্বপ্নে কত রোগার গায়ে পদ্মহস্ত বুলিয়ে নীরোগ করে দিলেন, তোদের ইতিহাস-মিন্সে তার খোঁজ রাখে ? এই তো সে দিনের কথা, সীতেনাথের মা বুড়ী মানত করে রেখেছিল—অক্ষয় তৃতীয়ায় বাবা তারকেশ্বরের দোরে নাতির চুল দেবে, ঐ একটি গুঁড়ো তো ? দেবে কি, নিজে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ল। দিন যত এগিয়ে আসে, মাগী মাথামুড় খুঁড়ে মরে ; কপাল গেল ফুলে, কেঁদে কেঁদে চক্ষু হল রক্তজবা ! শেষে দিলেন না বাবা স্বপ্ন ? বুড়ী বলে, সে কি মূর্তি ! শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'হবে না ? এত ভেদবুদ্ধি ! তবে তোদের বট তলায় তোদের জন্যে ভাঙা মন্দির আগলে কেন রয়েছি ? তারকেশ্বরে আমি আর এক শিব, না ?····বুড়ী বলে—'অপরাধ হয়েছে বাবা , জ্ঞানহীনা, অবলা নারী'····তার পর দিন মরতে মরতে গিয়ে বাবার পুজো দিয়ে এল, আর এমনই বাবার মহিমে, কোথায় গেল অমন বাত, কোথায় কি !····দেখা হল, বললাম, 'বলি অ সীতেনাথের মা, এই শুনলাম তোর অমন বাত, তারকেশ্বরে যেতে পারবি না'···তখন সব খুলে বললে, 'এই এই ব্যাপার মা, বাবার লীলে কে বুঝবে বল !'···না বাবা, ব্যাগাতা

করছি, তুই ওসব খেরেস্তানির মধ্যে থাকিস্ নে। আর তিনিই যদি না হবেন তো অমন ধবধবে শ্বেতপাথরের ষাঁড় কেন সামনে বসে থাকবে বল দিকিন? আর এও বলি—কেষ্ট কি বলরাম এঁদের কারুর নাম করতিস তো মানতামও—হয় তো হয়েছে ভুল; কিন্তু বুদ্ধদেব তো মানুষই ছিলেন, তিনি কি করে দেবতা হবেন বল্ তো? না, ছিঃ, মতিগতি বদলা!....হ্যাঁরে গৌরী, সবাই থাকতে অবিশ্বাস হল কি না তোরই?"

কথাটা বোধ হয় বাহির হইয়াই পড়িত—বিশেষ করিয়া তাহার অবিশ্বাস কেন হওয়া চলে না বা উচিত নয়। কিন্তু, বৃদ্ধা আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন—শাশুড়ীর বিশেষ করিয়া মানা আছে। দেবতা যখন দয়া করিয়া আসেন, জন্মকথা শুনিয়া ফেলিলে তাঁহাদের আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসে, তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ব্রতের দিনটা গৌরীনাথ আর মার মনে ব্যথা দিল না, তাহা ভিন্ন এখনও ভাল করিয়া দেখাও হয় নাই।

সাবিত্রী দেবী আরও খানিকটা বকিয়া গেলেন, "আর কাকেই বা দুষব? হাওয়াই যেন বদলে গেছে. সেদিন চৌধুরীদের বাড়ি সরস্বতী-পুজোর দিন অমনি—পুজো যা হল তাতো মা-ই জানেন—যেন শুধু একটা ঠাট বজায় রাখা। সন্ধ্যের সময় এক নেকচার! কি? না, এ সরস্বতী ঠাকুর একেলে ঠাকুর, বেদে পাওয়া যায় না, রামায়ণে পাওয়া যায় না—আরে গেল যা! একে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া বলব না? মা যদি না-ই ছিলেন তো তোর বেদ, রামায়ণ এল কোথা থেকে ভেবে দেখ দিকিন! না ভক্তি থাকে, মা তো যেচে পুজো নিতে আসেন না; বাড়িতে ডেকে এনে তাঁকে এমন করে অপমান করা কেন? আবার লোক জড় করে!...না, তুই বাবা ও-সবের মধ্যে থাকিস্ নি..."

মনুষ্যমূর্তি ঠাকুরের এই বিপরীত কাণ্ড দেখিয়া সমস্ত রাত মনে মনে পাষাণমূর্তির কাছে আবেদন জানাইলেন, "বাবা, এত আত্মবিস্মৃত

হ'লে মার প্রাণ কি করে বাঁচে বল দিকিন? আমার যে তোমায় ও ভিন্ন ভাববার যো নেই! যে-কটা দিন আছি, তুমি ওইরূপেই থাক—আমি যেন ওই বিশ্বাস নিয়েই মরতে পারি...”

[৩]

সকাল বেলায় সুবিধা হইল না; শিবরাত্রির প্রভাত, পূজার্চনা একটু বেশি রকম ছিল, তত্ত্বজিজ্ঞাসা মূর্তির কাছে ঘেঁসিবার অবসর পাইল না। বৈকালে গৌরীনাথ নোট-বুক আর পেন্সিল হাতে করিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক মন্দিরে কাটাইল।

বাড়িতে আসিয়া গৌরীনাথ মাকে বলিল, “না মা, তোমার শিব টেঁকলেন না, বুদ্ধদেবের দিকে প্রমাণ এত বেশি যে ..”

সাবিত্রী দেবী কতকটা বিস্মিতভাবে এবং কতকটা হতাশার সহিত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, “তুই বুঝি আবার সেখানে গিয়েছিলি?”

“শোন কথা মার! আমার বলে সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। পুরাতত্ত্ব জিনিষটা যে কি তা তো বোঝ না। এ-তো আস্ত একটা মূর্তি, একটা খোলামকুঁচি নিয়ে এক এক সময় রাতদিন যে কোথা দিয়ে যায়....”

সাবিত্রী দেবী কতকটা আশান্বিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কি রকম খোলামকুঁচি চাস গৌরী?”

গৌরীনাথ মার সারল্যে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, “হাসালে দেখছি মা' ছেলেবেলায় খোলামকুঁচি ঘসে ঘসে আমরা পয়সা করতাম, এখন দেখছি তুমি সেই পয়সার ঘুষ দিয়ে আমায় ভুলিয়ে দিতে চাও!”

সাবিত্রী দেবীও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, “না গো তুমি এখন মস্ত হয়েছ, মার সাধ্যি কি তোমায় ভোলায়।...তা তুই বলগে যা বাপু

বুদ্ধদেব যখন যুক্তি শুনবি নি তো কি আর করব ?. আমার ঠাকুর আমার কাছে শিবই আছেন ! এখন যদি বলিস তুই আমার ছেলে নয়, অমনি তাই কি হয়ে যাবে ? তিনি যখন সর্বঘটেই আছেন তখন তোর বুদ্ধ-মূর্তিতে থাকতেই যত বাধা ! যাঃ, বকাস নি আমায় !"

বেপরোয়া ভাবটা দেখাইলেম বটে, তবু যেন কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল মনটাতে—ঠাকুর দেবতা লইয়া একটা হৈ হৈ রটান....

মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল, একটু খোসামোদের সুরে বলিলেন, "হ্যাঁরে গৌরী, এমনও তো হতে পারে বাবা, যে, বুদ্ধদেব শিবত্ব পেয়েছেন ? তাই মেনে নিয়ে চুপ করে থাক্ বাপু, না হয় তোরই কোট বজায় রইল !"

গৌরীনাথের কি আর সে উপায় ছিল যে, চুপ করিয়া থাকিবে ? কলিকাতায় গিয়া সে বড় বড় কয়েকখানা কাগজে সাঁতরায় অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তিপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়া বড় বড় লেখা বাহির করিয়া ফেলিল। মাঝে আসিয়া একদিন খানকতক ফটো লইয়া গিয়াছিল, ব্লক সেগুলাও বাহির হইল। বটবৃক্ষটার বয়স, মন্দিরটার স্থাপত্য, শিলালিপির মধ্যে মুছিয়া যাওয়া কয়েকটা অক্ষরের আভাস প্রভৃতি হইতে একরাশি শকাব্দ, বিক্রমসংবৎ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি বাহির করিয়া গণিতের একটা দুষ্প্রবেশ্য ব্যাপার দাঁড় করাইল। এই সবের সহিত ব্লকগুলির দুর্বোধ্যতা মিলিয়া প্রবন্ধগুলা এমন এক একটা গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই প্রত্ন-তাত্ত্বিক মহলে রীতিমত একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মূর্তিটিতে একে এমনি কিছুই ছিল না, তাহাতে ছাপার আকারে আবার একেবারে লেপা-পোঁছা কালীমূর্তি হইয়া বাহির হইল। তাহার সহিত বুদ্ধদেবের যদি কোন সাদৃশ্য ছিল তো তাঁহার নির্বাণ অবস্থার, তাঁহার কোন পার্থিব মূর্তির সহিত লেশমাত্র সম্বন্ধ ছিল না ; কিন্তু বুদ্ধেতর কোন মূর্তির সহিতও সাদৃশ্য না থাকায় বিরুদ্ধ প্রমাণ বলিয়া ধরিবার উপায় ছিল না। কয়েকজন প্রাচীন

প্রত্নতাত্ত্বিক অবশ্য বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, কেহ কেহ জোর গলায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেনও, কিন্তু তাঁহারা কাগজে এরকম চোখরাঙানি খাইলেন যে, বেশি উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হইলেন না। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিল ইঁহারা নিজেরাই পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া পড়িয়াছেন—জীর্ণ রেলিক্—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় আর যোগ দিতে আসা কেন? কেহ বলিল—ইঁহারাই স্বরাজের পরিপন্থী—ইতিহাসের মুখে থাবা দিয়া দেশে আত্মচেতনা জাগিতে দিতেছেন না। ইহাতে সবাই যে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল এমন নয়, দু'একজন প্রতিবাদের সুরটা ধরিয়া রহিল; তবে গৌরীনাথের নূতন থিয়োরী—তৃতীয়-চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বাঙলার মূর্তি-শিল্পের উৎকর্ষ লইয়া বেশির ভাগই এমন মাতিয়া গেল যে, প্রতিবাদের আওয়াজ কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সাঁতরা জায়গাটি ছোট, নিরিবিলি, কলিকাতা হইতে কিছু দূরেও; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার লোকেও খবর পাইল যে, তাহাদের বুড়াশিব লইয়া বহির্জগতে কি একটা জটলা চলিতেছে। ক্রমে খবরটা স্পষ্ট হইয়া আসিল যে মূর্তিটি শিবের কি বুদ্ধদেবের এই লইয়া দেশে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সাবিত্রী দেবীর পুত্র গৌরীনাথ এর মূলে। রাস্তার মোড়ে, অশ্বত্থতলায় চণ্ডীমণ্ডপে এই লইয়া একটু একটু আলোচনা হইতে হইতে ক্রমে দারুণ মতভেদের সংঘর্ষে জায়গাটা খুব তাতিয়া উঠিল। একদল,—বেশির ভাগ বৃদ্ধ এবং কিছু কিছু নিতান্ত সেকেলে গোছের প্রৌঢ় বা যুবা, বলিতে লাগিল—মূর্তি আবহমান কাল থেকে যা আজও তা-ই। বাকি সবাই, বিশেষ করিয়া যুবারা গৌরীনাথের কথারই সমর্থন করিল। অল্পে অল্পে রীতিমত দলাদলি পড়িয়া গিয়া শ্রাদ্ধ ও বিবাহের আসর পর্যন্ত আক্রমণ করিল। যাহারা বুড়া শিবের পক্ষে রহিল—যুবারা তাহাদের নাম দিল 'বাবার পার্টি'; বুদ্ধ লইয়া ধর্ম হইতে স্খলিত বলিয়া

ধ্বনিসাদৃশ্যে যুবাদের নিজেদের নাম পড়িল—বুদ্ধিভ্রষ্ট। আক্রোশের ভঙ্গিতে মাঝে পড়িয়া শিলামূর্তির উপর ফুল-বিল্বপত্রের গাদা জমিয়া উঠিতে লাগিল। ওদিকে যুবারা 'অমিতাভ ড্রামাটিক্ ক্লাব' নাম দিয়া একটি সমিতি গড়িয়া বুদ্ধদেব-সংক্রান্ত একটি নাটকের জোর মহড়া দিতে লাগিল; শীঘ্র পারফর্মেন্স দিবে এবং তাহাতে গ্রামের মুখোজ্জ্বলকারী গৌরীনাথকে অভিনন্দিত করিবে।

ইহার মধ্যে গৌরীনাথ একদিন গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাকে বলিল, "সাহেব ছিলেন না, বিলেতে গিয়েছিলেন; সেদিন এসে সব দেখে শুনে বললেন, 'গৌরী, এই মূর্তিটিরই অভাবে আমি আমার বইখানা শেষ করতে পারছি না। তোমার গ্রামে এল কোথা থেকে?' সব শুনে বললেন··· হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি মা, সাহেব বলছেন মূর্তিটা মহাদেবরই; বৌদ্ধ আর শৈবযুগের সন্ধিকালে বাংলায় এ ধরণের মূর্তি-শিল্প ·· থাক্, সে-সব কথা তো তুমি বুঝবে না।"

সাবিত্রী দেবীর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিলেন, "আহা, দীর্ঘজীবী হোক্ তোর সাহেব, বাবা, আর বলতে যে হবেই গৌরী, তুই জিগ্যেস করে দেখিস, নিশ্চয় বাবা নিজে স্বপ্ন দিয়েছেন।"

"কিন্তু—হ্যাঁ, উনি আবার বলছেন আজকাল এ-মহাদেবের পুজো কোথাও প্রচলন নেই। সে যা-ই হোক্, মা, তোমার বুড়াশিব সত্যিই জাগ্রত,—তোমার ছেলেকে এই বছরেই বোধ হয় রায়সাহেব খেতাবটা পাইয়ে দিলেন···"

বৃদ্ধা মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, "কত ছলনাই যে জানো!" বাহিরে আর কিছু প্রকাশ না করিয়া পুত্রকে বলিলেন, "রায়সাহেব!—তোর আবার রায়সাহেবিতে কি দরকার গৌরী?"

বলা বাহুল্য, রায়সাহেবির উপর যতটা ব্যক্তিগত ঝোঁক, তাহার চেয়ে গৌরীনাথের বেশি এই আশা ছিল যে, মা ইহাতে লুব্ধ হইবেন,—মূর্তিটা

স্থানান্তরিত করা সহজ হইবে ; কিন্তু এমন একটা জবর সংবাদে খুশী হওয়া দূরের কথা, মা এমন বিসদৃশভাবে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন যে গৌরীনাথ, প্রথমটা যেন চকিত হইয়া গেল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, " 'তোর আবার'—মানে ? তোমার ছেলে কি নির্বিকার পরমব্রহ্ম ভেবেছ ?—কোন সাধ-আহ্লাদ নেই ? কত লোকে আজীবন চেষ্টা করে পারছে না, আমি যদি ফাঁকতালে পেয়ে যাই তো জোর বরাৎ বলতে হবে। সাহেব বললেন, 'গৌরী, এরকম মূর্তি সমস্ত বাংলায় দু'তিনটির বেশি নেই, কোথায় যে আছে ছড়ান এগুলি ধরতে পারছিলাম না। তুমি যদি মূর্তিটি এনে হাজির করতে পার, এই বার্থ ডে-লিস্টে'....বার্থ ডে-লিস্ট্ জান তো মা ?—রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে খেতাবের যে ফর্দ বের হয়....'রায় বাহাদুর'টা আর দেবে না, 'রায় সাহেব'টা স্বচ্ছন্দে হয়ে যায়।"

সাবিত্রী দেবী কতকটা অন্যমনস্ক কতকটা বিহ্বল ভাবে ছেলের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মুখ দিয়া যেন রা সরিতেছে না।

গৌরীনাথ বলিয়া চলিল, "তুমি যে ঘাবড়ে গেলে মা! তোমার মূর্তি নিয়ে দরকার তো ?—আমি জয়পুরের মূর্তি এনে দেব ;—শিব কি বুদ্ধ, কি গণেশ, কি নাড়ুগোপাল কোন সন্দেহ থাকবে না। আমি ভাবছি এখন নিয়ে যাই কি করে। তোমার 'বাবা'কে যদি "প্রিজার্ভেশন অব এন্‌সিয়েণ্ট মনুমেণ্ট এক্টে" ফেলি তো আস্তানা ছেড়ে সুড় সুড় করে যেতে হয়, কিন্তু তাতে অনেক সময় হৈ-চৈ হয়,—লোকের মন থেকে কুসংস্কার এখনও সম্পূর্ণ যায় নি তো ?—সাহেব তা চান না, দূর হলেও জায়গাটা কলকাতার কাছাকাছির মধ্যে ধরতে হবে কি না...."

একটু চিন্তিত থাকিয়া বলিল, "রোসো, দেখা যাক, বেশ একটা মতলব এসেছে মাথায়,—যদি লেগে যায়,—ওদের যদি দলে টানতে

পারি তো কার্য্যসিদ্ধি অবধারিত জেন মা। সাহেবের কাছেও খাতিরটা বেড়ে যায় কত; গবর্ণমেণ্টেরও নেকনজরে থাকা যায়। তা' ভিন্ন সি-আই-ই নাইটহুড্ সবই তো ঐ পথে,....দাঁড়াও...”

সাবিত্রী দেবী যেন একটা ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিয়া কতকটা ব্যাকুলভাবে এবং অনেকটা নিরাশভাবেই বলিলেন, “না গৌরী, একেবারে দেশ ছাড়া করবি বাপ, যখন বুঝলিই স্বয়ং তিনি—দু'টো বিল্বপত্র পেলে সন্তুষ্ট থাকেন—কি হবে ওঁর গবর্মেণ্টের কাছে কদরে আর খেতাবে বাবা?”

গৌরীনাথ হাসিয়া বলিল, “খেতাব ওঁর নয় মা, আমার।”

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, “মা ব'লে যার কাছে এসেছ তাকেও ভোলাবে?” বাহিরে বলিলেন, “ওঁরই হোক আর তোরই হোক্—ছাড় তুই খেয়াল গৌরী—বড় সব্বনেশে নেশা ও এক। ওরই পেছনে চৌধুরীদের অতবড় জমিদারিটা ধারে ধারে বিকিয়ে গেল; একবার ঝোঁক ধরলে টাকাকড়ি, ঠাকুর দেবতা কিছুই জ্ঞান থাকে না।”

[৪]

অমিতাভ ড্রামাটিক ক্লাবে ড্রেস্-রিহার্সাল চলিতেছিল। ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে গৌরীনাথ গিয়া উপস্থিত হইল।

সে গ্রামের লোক হইলেও বহুদিন হইতে—অর্থাৎ, সেই কলেজ যুগ হইতেই কলিকাতাবাসী, কালেভদ্রে প্রবাসীর মত আসে মাত্র, তাও বেশি মেলামেশার অভ্যাস নাই। কাজেই নিতান্ত যাহাকে 'গেঁয়োযোগী' বলে, সেরূপ হইয়া যায় নাই। অপরিচয়ের বা অল্প-পরিচয়ের ব্যবধানের জন্য নবীনদের মধ্যে বেশ একটা খাতির আছে, সম্প্রতি মূর্তি ব্যাপারে সেটা বাড়িয়াও গিয়াছে বরং। সে আসিতে সবাই একটু তটস্থ হইয়া পড়িল।

ক্লাবের সেক্রেটারি অনাদি একটি নড়বড়ে চেয়ারকে রথের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সারথির পার্ট করিতেছিল; পরম আগ্রহে চেয়ারটা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বসুন।"

গৌরীনাথ পলকে চেয়ারটির বিপজ্জনকতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! সে কি হয়? আপনি বসে রয়েছেন চেয়ারটায়। আমি এই চৌকিতে বসছি। চলুক আপনাদের। ডিস্টার্ব করলাম না কি?"

যে বুদ্ধদেবের পার্ট করিতেছিল, সে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "না, ডিস্টার্ব কি বলছেন, বরং যদি মাঝে মাঝে দয়া করে এসে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন। চেষ্টা করছি আমরা, তবে ঠিক ক্যালকাটা স্টাইলের বুদ্ধদেব কি ফোটাতে পারব?"

সারথি অনাদি বলিল, "শোনাও না গৌরীদাকে পার্টটা একবার।"

গৌরীনাথ সুবিধাটা হাতছাড়া করিল না। খানিকক্ষণ উৎকট চীৎকার হাত পা আছড়ানি ঔষধ-গেলা গোছের করিয়া সহ্য করিল। অঙ্কটা শেষ হইলে অনুতাপের সুরে বলিল, "আমি ভাবছি গ্রামটা অভাগা।"

"কেন?...ও কথা বললেন কেন?" কয়েকজন উৎসুক প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

"এই এমন শক্তি—এইখানেই নষ্ট হবে তো? বাইরে গেলে অনুকূল অবস্থায় পড়লে গ্রামের মুখোজ্জ্বল হ'ত।"

বুদ্ধদেব লজ্জিতভাবে চৌকিটা খুঁটিতে খুঁটিতে সস্মিত বদনে কহিল, "গ্রামের মুখোজ্জ্বল তো আপনিই করেছেন।"

অন্য একটি ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনার রিসার্চ না হ'লে আজ সাঁতরাকে চিনত কে?"

অনাদি বলিল, "আর আজ না চেনে কে?"

গৌরীনাথ বলিল, "ও কি জানেন? রিসার্চের মালমসলা যখন

মজুদ তখন এক দিন না একদিন ধরা পড়তই, তবে আমারই নজরে পড়ে গেল, এই যা। তা-ও কি আমিই যতটা করতে পারতাম পারছি করতে?"

বুদ্ধদেব অগ্রসর হইয়া চেয়ারটার পিছে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, বলিল "সে কি কথা! সামান্য একটা ভাঙা মূর্তি নিয়ে, দেশময় যে সাড়া পড়িয়ে দিয়েছেন!..."

চেয়ারটা ক্যাঁচ করিয়া নড়িয়া উঠিতে অনাদি বলিল, "তুমি একটু সরে দাঁড়াও ভাই; এ-রথ রথী-সারথি উভয়ের ভর একসঙ্গে সইবে না।"

গৌরীনাথ বলিল, এই মুর্তিটার কথাই ধরা যাক্, ওর দ্বারা দেশের যে একটা স্থায়ী গৌরব হ'ত তা কি হ'তে পারবে? কাগজের হৈ চৈ দুদিন পরে কাগজেই চাপা পড়ে যাবে; এদিকে গঙ্গার বেলোজলের ঘষ্টানি খেয়ে খেয়ে দিন কতক পরে মূর্তির গায়ে যা একটু আধটু ইতিহাসের আঁচড় আছে এখনও, তাও যাবে মিটে। কে আর এসব কথা ভাবতে যাচ্ছে বলুন!

না ভাবিবার দোষ হইতে বাঁচিবার জন্য সকলেই মুখে দারুণ ভাবনার রেখা ফুটাইয়া তুলিল। যে শুদ্ধোদন সাজিবে, পুত্রবিরহের গভীর হতাশার ভাবটা অভিনয় করিয়া সে বলিল, "এর কি কোনও উপায় নেই?"

গৌরীনাথ বলিল, "উপায় আছে এখনও এবং আছে আপনাদের হাতেই, অর্থাৎ গ্রামের তরুণদের হাতেই। আপনারা যদি সাহায্য করেন তো আমি মূর্তিটার একটা ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে মূর্তিটিও রক্ষা পায় সাঁতরারও নাম চিরকালের জন্য ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে। কিন্তু, তাতে মূর্তিটা ঠাঁইনাড়া করতে হয়! আপনাদের মধ্যে যাঁরা মিউজিয়ামের মূর্তি-বিভাগ দেখেছেন, তাঁরা আমার কথাটা বুঝতে পারবেন। সেই সব মূর্তি আমাদের দেশে হাটে-বাটে, ভাঙা দেউলে পড়ে ছিল; কোন কোনটা বোধ হয় পূজোও পাচ্ছিল, যেমন এ মূর্তি পাচ্ছে; কিন্তু বলুন তো আজ ইতিহাস তার বিজ্ঞানসম্মত মন্দিরে বসিয়ে তাদের যে গভীর

শ্রদ্ধাযত্নের সঙ্গে পূজো করছে, সে পূজো কি অন্যত্র সম্ভব ছিল? দেখুন আমাদের শাস্ত্রের মধ্যেও ভাঙা দেবতার পূজো বারণ, কেন না সে দেবতা প্রাণহীন। কিন্তু দেবতা যে পরিমাণে ধর্মচক্ষে প্রাণহীন, ঠিক সেই পরিমাণে ইতিহাসের চক্ষে প্রাণবন্ত, কেন না ছোট থেকে বড় পর্যন্ত তার প্রত্যেক অঙ্গহানি এক একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য। দেবতা যখন ধর্মের রাজ্যে মরেন, তখন ইতিহাসের রাজ্যে তার হয় রেসারেক্শন অর্থাৎ পুনর্জন্ম। তখন তাঁকে ঘরে বেঁধে রেখে মাথায় জল ঢাললে কোনই ফল হয় না, শুধু ইতিহাসের সাক্ষী ভাঙানর দোষ হয়। আপনারা বোধ হয় বলবেন ইতিহাসের কি দরকার? এই ভাঙা মুড়ি যদি লোকের মনের ধর্মভাবটা জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয় তো ওকে রেহাই দাও না। এই বিজ্ঞানের যুগে আপনারা, দেশের তরুণরা যদি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা না বোঝেন আর তার আসনে অন্ধ সংস্কারকে বসান তো আমার কিছুই বলবার থাকে না…"

একটা মিশ্র আওয়াজ উঠিল, "না, না, বলুন….ইতিহাস চাই বৈ কি… ইতিহাসের অভাবে…" যাহারা কম তরুণ তাহাদেরই আওয়াজটা বেশি স্পষ্ট।

গৌরীনাথ বলিয়া চলিল, "তা হলে বোধ হয় কিছু অপ্রিয় হলেও একটা কথা আমি বলব। কেন না আমি তো গ্রামের বৃদ্ধদের মধ্যে কথা কইছি না, কইছি সেই তরুণদের মধ্যে যারা দেশের ভবিষ্যৎ। ইতিহাস আর ধর্ম—কোনটা স্থায়ী? কালের কষ্টিপাথরে কোন্‌টার দাগ অমিট থাকে?—কত ধর্ম এল কত গেল—কোথায় এখন ফ্যারাওদের ধর্ম;—আইসিস্, রা, থিয়া?—হ'ল গ্রীসের অভ্যুদয়, এল জুপিটার, এপোলো, ভিনাস্, মিনার্ভা—কোথায় তারা এখন? বর্তমান যুগের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা ছিল। কালের দরবারে তাদের এইটুকুই সার্থকতা যে মানবমনের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করবে তারা। তার মানে তাদের সবচেয়ে

বড় গুণ এই যে তারা ইতিহাস-সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। এই ইতিহাস হচ্ছে কালের সহযাত্রী—যা কিছু হচ্ছে সব এরই মধ্যে। বর্তমান যুগে যে-জাতের এই ইতিহাস নেই, সে-জাত সভ্য জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, দাঁড়াবার অধিকারও নেই। মানুষের কথা ছেড়ে দিন, একটা কুকুরেরও ইতিহাস না থাকলে, অর্থাৎ সে পেডিগ্রীড্ না হলে আজ তার সভ্য জগতে ঠাঁই নেই। এ অবস্থায় আপনারা কি সর্বোতোভাবে ইতিহাস গড়ে তোলাটাকে দেশের সবচেয়ে বড় কাজ মনে করেন না? আর ইতিহাসের মালমসলাকে কুসংস্কারের কাছে বলি দেওয়াটাকে একটা গর্হিত, আত্মঘাতী কাজ বলে মনে করেন না?...

"আমি বলছি—আপনারা আমায় এ-মূর্তিটি দিন। এর গুরুত্ব আপনাদের কাছে সবিস্তারে বলবার সময় নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, এর পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ আর শৈব পর পর দু'টি ধর্মেরই প্রভাব রয়েছে বলে বড় বড় সাহেবরা সন্দেহ করছেন। তাঁরা বলছেন, এতে বাংলার ধর্মের আর মূর্তিশিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস ঠাসা রয়েছে। এহেন এক সম্পদ্ যা গ্রামের বহু ভাগ্যবলে পাওয়া গেছে সেটা কি আপনারা ভাঙা মন্দিরে চাপা পড়ে নষ্ট হতে দেবেন, না... ?"

একটা কলরবের মত উঠিল, "না না, আপনি নিয়ে যান। আমাদের কিছু আপত্তি নেই..."

"আপনাদের আপত্তি যে থাকবে না তা আমি আশাই করেছিলাম। থাকবে কয়েকজন বড়দের আপত্তি, তাঁরা বলবেন—দেবতাজ্ঞানে যখন মূর্তিটিকে পূজো করছে এখনও..."

একজন বলিল, "তাঁদের কথা শুনবে কে?"

অনাদি বলিল, "আর যারা ঠাকুর বলে মনে করে—'বাবার দলের' লোকেরা গুনতিতে কমও,—হোপলেস্ মাইনরিটি, ঠেকাতে পারবে না। আমাদের ক্লাবে তো বলতে গেলে সবাই বুদ্ধ পার্টির।"

এক কোণে একটি ছোকরা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল এতক্ষণ, দাঁড়াইয়া উঠিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "না আমি বিশ্বাস করি মূর্তিটা মহাদেবের, থিয়েটারে জয়েন্ করছি সে আলাদা কথা, আর্ট হিসেবে...."

সে একটা প্রবল আপত্তি করিবে ভাবিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরটাতে অভিনয়ের হাওয়া ছিলই; যেন একটা উগ্ররকম আত্মোৎসর্গ করিতেছে, মুখে এবং গলার স্বরে এই ভাব ফুটাইয়া ছোকরা বলিল, কিন্তু দেশের কাছে—দেশের ইতিহাসের কাছে আমি দেবতাকেও মানতে চাই না। আমার সুধু একটা অনুরোধ—সাঁতরায় দেবতা আজ যাচ্ছেন ইতিহাসের সাক্ষ্য; তাঁকে সেই ভাবেই বিদায় করা হোক। আমার প্রস্তাব—পাঁজি দেখে একটি শুভদিন দেখা হোক—সেটির নাম দেওয়া হোক 'বুড়াশিব ডে' (Bura Shib Day), আর উপযুক্ত বাজনাবাদ্যি, কাঁসর-ঘণ্টার সঙ্গে বাবাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হোক।"

* * * *

গ্রামে বিশেষ কিছু সাড়াশব্দ, ওজর আপত্তি উঠিল না। মৃতজাতির দেবতা—তাদের ধর্মবিশ্বাস একটা প্রাণহীন আচার মাত্র। ফুলে পাতায় সাজান গাড়িতে চড়িয়া—বুড়াশিব চলিয়াছেন যাদুঘরে ইতিহাসের কাছে তাঁহার জবানবন্দি দিতে। বিলাতী ব্যাণ্ড, কাঁসরঘণ্টা, আতসবাজি.... গ্রামের একটা উৎসব...বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা ভুলিয়া অনেকেই আসিল দেখিতে—একটা অভিনব তামাসা—এই প্রথম আর এই শেষ।

সারা গ্রামখানার মধ্যে শুধু একজনের বিস্ময়বিমূঢ় মনে একটা গভীর দাগ বসিয়া রহিল, কেনমা সেই একজনের কাছে দেবতা ছিলেন দেবতা—শিলা মাত্র নয়;—যে-দেবতাকে সে একদিকে দিয়াছে বক্ষের স্তন্য আর অপর দিকে দিয়াছে গভীর ভক্তি।—

উৎসবমত্ত জনতা থেকে দূরে, জীর্ণ বটের একটা ঝুরির কাছে দাঁড়াইয়া সাবিত্রীদেবী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বড় গভীর দুঃখেই তাহার বহুদিনের

আশঙ্কাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন, "করেছিলাম চেষ্টা ; কিন্তু তোমাকেও যেদিন কলিকালে ধরলে বাবা—যেদিন বুঝলাম পোড়া রায়সাহেবির মোহ



বুড়াশিব চলিয়াছেন........তাঁহার জবানবন্দি দিতে

তোমায়ও পেয়ে বসে তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়েছে, সেদিন থেকেই আমি সব আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়েছি।"

[১৩৪৩]

সম্মতি

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "আদালত-আদালত একালের একটা বাই হয়েছে দাদা-ঠাকুর। এগুনে, মানে আমাদের সময়ে এসব ছেল না। তার আগেও ছেল না। দুজ্জোধন যখন বললেন—'ছুঁচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে ততটুকু পর্যন্ত দোব না, কই, এঁরা পাঁচ ভাইয়ে তো কৌশুলী ডেকে আদালতে গিয়ে উঠলেন না।...মোট কথা মকদ্দমা করলেই যে সম্পত্তি জ্ঞানটা খুব টন্‌টনে হ'ল একথা মানব না, দাদাঠাকুর। ওটা হ'ল ট্যাকার গরমাই। শুনছেন তো—ঢোলের আওয়াজটা?—ট্যাকা আছে, কলকেতা থেকে কৌশলী আনিয়ে মকদ্দমা জিতে দত্তরা লবীনের বাগানের ওপর দাঁড়িয়ে নিলেমের ঢ্যাডরা পিটোচ্ছে। ট্যাকার গরমাই, একে সম্পত্তি-জ্ঞান বলব না।"

স্বরূপ আবার খানিকক্ষণ একমনে বাঁশের বাতাটা চাঁচিল, তাহার পর হাত থামাইয়া বলিল, "কেমন করে বলব ক'ন না, আমরা যে অন্য রকম দেখেছি কি না। বেশি দূরের কথা নয়, এই তিনটে গেরাম পেরিয়েই বাতাসপুরে। বেশি দিনেরও কথা নয় এমন, কতই বা আমার বয়েস হবে ত্যাখন? ধরুন দশ—জোর, বারো। যদি মনে করেন স্বরূপ মিছে বলছে তো পাশের গেরামে গিয়ে খোঁজ নিলেই হবে,—বাঞ্ছারামের নাতি-নাতকুড়েরা এখনও বাতাসপুরের ছ-আনিদের দেওয়া নাখরাজ রাজার হালে ভোগ করে যাচ্চে।

"বাতাসপুরের ছ-আনি তরফের কত্তা ত্যাখন উমেশ পাল। সবে কিছুদিন আগে সম্পত্তি ভাগ হয়েছে—দশ আনি আর ছ-আনি এই দু-তরফের মধ্যে খুব রেষারেষি। ভৈরব পাল যদি উত্তুর দিকে যায় তো উমেশ পাল যাবে দক্ষিণ দিকে! উমেশ পাল মায়ের শ্রাদ্ধে সাতখানা

গেরাম বলে খুব ধুমধাম করলে ; ভৈরব পালের সেরাদ্দ করবার জন্তে না ছেল মা, না ছেল মাসী, না ছেল খুড়ী ; মেয়ের এক দূর সম্পক্যের জ্যেঠশাশুড়ী কোথায় পড়ে ভুগছিল, তাকে দেশে নিয়ে এসে ঘটা করে গঙ্গাযাত্রা করালে,—তারপর সেরাদ্দ যা করলে তাতে উমেশ পালের মুখে চূণকালি মাখিয়ে দিলে একেবারে।....উমেশ পালের হাতে তখনও এক খুড়ী রয়েছে, বিধবা। কে জানে ভাসুর-পো যেমন খেপে আছে, রেষারেষির মাথায় কখন কি ঘটিয়ে বসবে—এই ভয়ে তিনি রাতারাতি একদিন সরে পড়ল ! ভাবটা—আমার ঘটা করে সেরাদ্দর কাজ নেই বাপু, কোনোরকমে দুটো দিন বাঁচি আগে ! দশ বছর পরে সেতু বন্ধ তীথ্য থেকে তাঁর মিত্যুর খবর যেদিনকে পাওয়া গেল, উমেশ পাল তিলকাঞ্চন করে গোণাগুণতি বারোটি বামুন খাইয়ে দায় খালাস হল। দোষ দেবেন কি করে দাদাঠাকুর ? খুড়ীর ব্যাভারটা তো ভাল হ'ল না !

"এইরকম কাণ্ড,—পুজো বল, পাব্বণ বল, অতিথ বল, কুটুম বল—সব নিয়েই রেষারেষি—এমন রেষারেষি যে, সমস্ত গেরামটা অষ্টপহর সরগরম হয়ে আছে। সমস্ত তল্লাটটায় পালেদের ঝগড়া নিয়ে একটা ডাক পড়ে গেল ! এই সময় বাঞ্ছারাম হঠাৎ কেমন করে একদিন ধরা পড়ে গেল।

"বাঞ্ছারাম যেমন সিঁদও কাটত তেমনি আবার সুবিধে পেলে দিনমানেই গেরস্তর থালাটা, বাটিটা, কাপড়টা, গামছাটা বেমালুম পাচার করে দিত। খুব হাতসাফাই ছেল, কিন্তু বিধেতাপুরুষ যখন মুখ তুলে চান, তখন হাতসাফাইয়ে আর কি করবে বলুন দাদাঠাকুর ? ধরা পড়ে গেল !"

আমি কতকটা বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "অথচ বলছ বিধাতা-পুরুষ মুখ তুলে চাইলেন ?"

স্বরূপ হাত থামাইয়া একটু মৃদুহাস্যের সহিত আমার পানে চাহিল, বলিল, "ধৈর্য ধরে সবটা শুনতে হবে দাদাঠাকুর। যদি দেখেন স্বরূপ

মণ্ডল ভুল বলেছে, যেমন অভিরুচি সাজা দেবেন! তাতক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।...হ্যাঁ, কি যে বলছিলুম—বাঞ্ছারাম আর সেবারটায় পারলে না চোখে ধুলো দিতে, ধরা পড়ে গেল।...বাতাসপুরের দশ-আনি আর ছ-আনি তরফের বাড়ি দুটো পাশাপাশি ; মাঝখানে কুল্যে একটা পুষ্করিণী। ভাগাভাগিতে দশ-আনি তরফের ভৈরব পাল পেলে বসত-বাড়িটা, তারপরেই পুষ্করিণীটা, তারপরে কাছারি-বাড়ি। উমেশ পালের ভাগে পড়ল কাছারি-বাড়িটা। সেইটেকেই লম্বা দেয়াল দিয়ে ঘেরেঘুরে, দোতালার ওপর আর একতলা উঠিয়ে উমেশ পাল যা বাড়ি হাঁকড়ালে তার সামনে দশ-আনিদের বাস্তু কানা হয়ে গেল। ছোট তো হ'তে পারে না জ্ঞাতির কাছে?—তখন ভৈরব পালও আবার দোতালার ওপর আর একতলা চাপাতে সুরু করে দিলে। মানে খুন চেপে গেল আর কি দু তরফের মাথায়—এ যদি বলে আমার বাড়ি দোতলা তো ও বলে আমি তেতলা তুললুম, ওর যদি তেতলা শেষ হল তো ও বলে আমি চারতলা তুলব, এর চারতলা তো ওর পাঁচতলা, এর পাঁচ তো এর ছয়, এ যদি বলে আমার ছয়, তো...”

স্বরূপ কাটারিশুদ্ধ হাতটা এক একতলার অনুপাতে ধাপে ধাপে তুলিতেছিল। সাতের কাছে যখন আসিল, আমি তাহার হাতের পানে বিমূঢ়ভাবে চাহিতে হাতটা নামাইয়া বলিল, “না, সাততলা পর্যন্ত উঠতে পেলে আর কৈ?—ভৈরব পালের তেতলা শেষ হয়ে চিলেকোঠা উঠছে এমন সময় কোথা দিয়ে কি হ'ল—সমস্ত চিলেকোঠাটা, তেতলার খানিকটা, দোতলার খানিকটা, মায় পুরণ একতলারও কোণের দিকটা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল। ভৈরব পাল একটা ছুতোনাতা করে উমেশ পালের সঙ্গে ঠিক একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিত কিন্তু...”

আমি আবার বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, “এতে উমেশ পালের দোষটা হ'ল কোথায় বুঝছি না তো স্বরূপ?”

স্বরূপ মৃদু হাসিয়া বলিল, "দোষ মোকদ্দমা, সালিসী—এসব হ'ল আপনাদের একালের কথা দাদাঠাকুর, সেকালে এসব তো ছেল না।.... তুমি কোট্ করে একতলার ওপর দোতলা চাপাতে গেলে বলেই তো আমার এই ক্ষতি আর অপমানটা হ'ল—সে কালের লোকেরা কথাটা এইরকম সোজাসুজি ভাবেই ধরত কি না।...নির্ঘাৎ একটা হাঙ্গামা বেঁধে যেত এক আধ দিনের মধ্যে, কিন্তু উমেশ পালের গুরুঠাকুর ব্যাপারটা সামলে দিলে। তিনি পুকুরে চান আহ্নিকটুকু সেরে গামছাটি মাথায় পাট করে দশ-আনিদের শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে ঐ পথ দিয়ে বাড়ি সেঁদুচ্ছেল, আদ্দেকগুলি ইঁট নেমে মন্তরসুদ্দ্ তেনাকে চাপা দিয়ে দিলে। তবু মন্দের ভাল বলে ভৈরব পাল গায়ের জ্বালাটা গায়েই মেরে নিলে। বাড়ি পড়া নিয়ে আর কোন গোলমাল করলে না। উমেশ পালের তেমন গুরুভক্তি টুরুভক্তি ছেল না দাদাঠাকুর—সবার তো সমান হয় না? তবুও বাতাসপুরের লোকেরা কি হয় কি না হয় করছে,—এমন সময় আপনাকে যা বলছিলুম, বাঞ্ছারাম ধরা পড়ে গেল।

"বাঞ্ছারামকে এ তল্লাটে সবাই চেনে, সাবধান থাকে; কিন্তু বাতাস-পুর তো দূরে; সেখানে তাকে বড় একটা কেউ চিনত না। না চেনার দরুণ উমেশ পালের বাড়িতে দিন মজুরীতে সে একটা কাজ পেয়ে গেছল।....দুপুর গড়িয়ে গেছে, শীতকালের বেল', মজুরী সেরে বাঞ্ছারাম গায়ে সুতী র‍্যাপারটুকু জড়িয়ে দাঁতন করতে করতে ঠুক ঠুক করে চলেছে। এইবার চানটা সেরে খুদ্ মুড়ি যা জোটে একমুঠো গালে দিয়ে আবার খাটুনিতে নামবে, এমন সময় হেঁড়ে গলায় এক ডাক—'কে জাতা হ্যায়!'

"রাস্তাটা ভৈরব পালের দেউড়ির সামনে দিয়ে। বাঞ্ছারাম ফিরে দেখে সিং দরজায় একটা তেপাইয়ের ওপর এক বেটা নতুন পশ্চিমে দরোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে বাঞ্ছারামের বুক একেবারে শুকিয়ে গেল। কি তেওয়ারী না কি নামটা, আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, এগুনে

পুলিশে কাজ করত, বাঞ্ছাকে এর আগে জেলে দেখেছে। বেশ ভাল করে চেনে।....মুখ ফিরুতেই জিগ্যেস করলে, 'বাঞ্ছারাম আছ না? এখানে কোথা থেকে?'

"যেমন বলা উচিত—খুব এক লম্বা সেলাম ঠুকে বাঞ্ছারাম বললে,



বাঞ্ছারাম আছ না?

হ্যাঁ, আমিই দারেগা সায়েব, গতর খাটিয়ে এক মুঠো উপার্জ্জন করে যা

জোটে তাতেই কোনরকমে দিন গুজরান করছি। অনেকদিন পরে দর্শন পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল!'

"মানে মন ভিজোবার যতরকম কথা হ'তে পারে বাঞ্ছারাম আওড়ে দিলে, কিন্তু কথায় বলে, চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী, আর কথাতেই যদি মন ভিজবে তো পশ্চিমে বলেচে কেন?....তেওয়ারী সব শুনে চোখ পাকিয়ে বললে,—'তোমারা ব্যাপারকে ভেতরমে ফোলা কেন?'

"বাঞ্ছারাম একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'দুটো মুড়ি কিনেছিলুম, দারোগাসাহেব চান করে উঠে মুখে দোব।...আচ্ছা, এখন তাহলে আসি, বড্ড তাড়াহুড়ো রয়েছে, জমিদারের মজুর খাটছি কি না। সন্দের সময় এসে ভাং ঘুটে দিতে হবে দারোগা সাহেবকে, অনেক দিন সেবা করতে পাই নি...'

"তেওয়ারী তেপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, গোঁফে একটা চাড়া দিয়ে গলা চড়িয়ে বললে, 'তোম এদিকে আবেগা কি হামকো উঠনে পড়েগা?'

"তেওয়ারীর শরীর আগে থেকে ভারী হয়ে গেছে, বাঞ্ছারাম ছুট দিলে যে দৌড়ে ধরতে পারত এমন নয়, তবে কথা হচ্ছে যখন যেটা ঘটবার সেটা ঘটবেই কিনা দাদাঠাকুর, বাঞ্ছারাম কেঁচোটির মত গুর গুর করে এসে কাছে দাঁড়াল। দাঁড়াতে দেরি, তেওয়ারী ব্যাপার ধরে দিলে এক রাম-ঝটকা। ব্যাপারটা তো হাতেই থাকুক, একদিকে বাঞ্ছারাম ঐ হুখানে ছিটকে পড়ল, আর একদিকে এই এত বড় এক রূপোর পানের ডিবে। তেওয়ারী বললে—'উঠায় করকে লে আও।'

"বাঞ্ছারাম আস্তে আস্তে ডিবেটা কুড়িয়ে এনে দিতে হাত ধরে আর একটা ঝটকা দিয়ে দে মার। পুলিশের কাজ ছাড়া পর্যন্ত আসামী পায় নি, হাতটা নিসপিস করছিল, মার যা দিলে তার আর হিসেব রৈল না দাদাঠাকুর। দশ-আনি দেউড়ির আমলা গোমস্তা যে যেখানে ছিল ছুটে এল, কেউ থামাবার চেষ্টা করলে, কেউ ওরই ওপর আরও দু-ঘা বসিয়ে

হাতের সুখ করে নিলে। কেরমেক সোরগোলটা যখন বেড়ে গেল, তখন ছ-আনিদের তরফ থেকেও কয়েকজন এসে জুটল।

"ছ-আনি তরফের দারোয়ানের নাম পাঁড়ে। অমন লাসও কেউ এ তল্লাটে কখনও দেখে নি, অমন রুক্ষ মেজাজও না। রুটির ময়দা ঠাসছিল, চোর ধরা পড়েছে শুনে তালটা থালায় ঢাকা দিয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এসে উপস্থিত হল, ভিড় ঠেলে সামনে এসে জিগ্যেস করলে, 'ক্যা হুয়া হ্যায় ?'

"তেওয়ারী দেশওয়ালীর কাছে বাহাদুরি দেখিয়ে বললে, 'শালা, রূপোর ডিবে চুরি করে পালাচ্ছেল পাঁড়েজী, ধরেছি।'

"পাঁড়েজী একে লোকটাই গোঁয়ার, তায়—যেমন হয়ে থাকে দাদা-ঠাকুর ;—নিজে কখনও পুলিশে কাজ করত না বলে তেওয়ারীর ওপর ভেতরে ভেতরে খুশি ছিল না। তার ওপর আবার যখন বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে বুঝলে যে, তেওয়ারী তার জন্যে কিছু বাকি রাখেনি তখন ভয়ংকর খাপ্পা হয়ে উঠল। তা ছাড়া মনিবের মেজাজও বুঝত ; জিগ্যেস করলে—'ডিবে কোথায় ?'

"তেওয়ারী ডিবেটা হাতে তুলে দিলে। ডিবেটা হাতে নিয়ে পাঁড়েজি বললে—'এ তো দেখছি আমাদের বাড়ির ডিবে। চোরকে ছেড়ে দাও।' তেওয়ারী নতুন এসেছে, দুপক্ষের সব ব্যাপারটা শোনে নি তখনও, তায় পুলিশের লোক সোজা পদ্ধতিটাই জানে। একটু হতভম্ব হয়ে থেকে বললে, 'বাঃ চোরকে ছেড়ে দেবো কেন ?—ধরা পড়েছে, তাকে পুলিশে দিতে হবে।'

"পাঁড়েজি একটা সুবিধেই খুঁজছেল,—পুলিশের নাম হতেই তো ওদের নিজেদের ভাষায় চোখা চোখা একরাশ গাল ঝাড়লে, নিজে পুলিশ ছেল না বলে বরাবর একটা আক্রোশ ছেল কিনা। তারপর এগিয়ে বললে—'মাল আমার, চোরও আমার, হাম য্যাসা খুশি করেঙ্গে চোর দে-দেও।'

"তেওয়ারীরও রোখ চেপে গেল, বাঞ্ছারামকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বললে—'কোভি নেই ছোড়েঙ্গা, চোর সরকার বাহাদুরকা হ্যায়।'

"বলতে দেরি, চিতুনো বুকে এক রাম রদ্দা কশিয়ে তেওয়ারীকে হটিয়ে পাঁড়েজী ধরলে বাঞ্ছারামের টুঁটি টিপে, তারপর সে যা আরম্ভ হ'ল দাদাঠাকুর সে এক রামায়ণ মহাভারতেই গপ্‌প শোনা যায়; প্রথমে তো নিজেদের মধ্যেই দিব্যি খানিকক্ষণ চড় ঘুসি অদল-বদল করলে দু-জনে, তারপর চোর নিয়ে টানাটানি—একজন ধরলে দুটো নড়া বাগিয়ে, একজন ধরলে দুটো পা, তারপর টানাটানি, হেঁচড়া-হেচড়ি—এ একবার পাঁড়েজী সুদ্দ্য হিড়হিড় করে দেউড়ির দিকে টেনে নিয়ে যায় তো ও একবার তেওয়ারী সুদ্দ্য সিংদরজার পাঁচ হাত বাইরে হিচড়ে নিয়ে আসে—'হামকো চোর' তো হামকো সরকারী চোর'! আমরা সবাই হাঁ করে তামাসা দেখচি। আমি ত্যাখন খুড়োর কাছে বেশির ভাগ থাকতাম কিনা—একবার মনে হচ্ছে বুঝি নড়া দুটো ছিঁড়ে গেল আবার মনে হচ্ছে, পাদুটো বুঝি বাঞ্ছারামের কোমর থেকে খসে বেরিয়ে গেল। জন্মে আর একবার মাত্র সে-রকম কাণ্ড দেখেছি দাদাঠাকুর, কলকেতার গড়ের মাঠে দু-দল গোরা খেলছেল—তা সেটা ছেল একটা কাছি নিয়ে। গোটা একটা নিরীহ মানুষ নিয়ে—আর সে-মানুষও আমাদের জানাশোনা বাঞ্ছারাম—এ ধরণের কাণ্ড আর দেখি নি কখনও। তামাসা দেখতে বোধ হয় দু-তরফে এমন শতাধিক লোক জমা হয়ে গেছে, খিস্তি খেউড় যা চলছে তার আর লেকা-জোকা নেই।...মাঝখানে ঐ রকম সমুদ্রমন্থনের পালা চলেছে।..."

বলিলাম, "মারা গেল না লোকটা স্বরূপ? গল্প শুনেই তো আমার আদ্দেক হয়ে এসেছে!"

স্বরূপ হাসিয়া উত্তর করিল, "কথায় বলে—চোরের পরাণ ভোমরার

মধ্যে থাকে দাদাঠাকুর, তাছাড়া ওকে মরতে হবে যে অন্যভাবে, ত্যাতক্ষণ পর্য্যন্ত ওকে ধকলটা সামলাতেই হবে কিনা—তা না হলে নিয়তি আর বলেছে কেন ?...তারপর যা বলছিলুম,—বাঞ্ছারামের এর পরে যখন জ্ঞান হল, তখন দেখে সে ছ-আনিদের কাছারির সামনে ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে, চারিদিকে একপাল লোক। পাশেই পাঁড়েজী, দশ-আনিদের দেউড়ির দিকে চেয়ে এক একটা হুংকার ছাড়ছে আর তাল ঠুকছে—'আব ত্থাখো, কিসকা চোর হ্যায়, শালা তেওয়ারী! হামকো সামনে পুলিশগিরি ফলানে আয়া হ্যায়!'

"উমেশ পাল আহারাদি করে এই সময়টা ভেতরে থাকে। রাজামানুষ, একটু রঙেই থাকে, বুঝতেই পারেন, দাদাঠাকুর। পেরাই তো এই রকম ব্যাপার হচ্ছে দু-বাড়ি নিয়ে, গা করে না। তেমন তেমন কিছু হ'ল—খবর গেল ভেতর। দরকার মনে হয় বেরিয়ে এল, নয়তো হুকুম পাঠিয়ে দিলে। এই রকম করে চলে। এবার তো কাণ্ডটা একটু ঘোরালই হয়েছে—দাওয়ানজি খানসামাকে দিয়ে এত্তালা দিয়ে দিলে। খানসামা ছেল আমারই খুড়ো ভবানী মণ্ডল দাদাঠাকুর। এত্তালা হল—এই এই রকম রূপোর ডিবে নিয়ে চোর পালাচ্ছেল, ও দেউড়ির দারোয়ান, আটকে রেখে মারপিট করছেল, পাঁড়েজী তাকে বামালসুদ্ধ্য ছাড়িয়ে নিয়ে এসে আটক রেখেছে, হুজুরের কি হুকুম হয়।

"উমেশ পাল চোখ বুজে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেল, বললে—'শির লে আও!'

"কাঁচা মাথা একটা কেটে ফেলা সে সময় খুব বেশি কথা ছেল না দাদাঠাকুর! খুড়ো বাইরে এসে হুকুম শুনিয়ে দিলে। শুনতে দেরি,মার খেয়ে বাঞ্ছারামের যে একটা ঝিম্ ধরেছেল কোথায় গেল উড়ে, ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলে। চোরের কান্না, তার

আবার মশানে যেতে বসেছে, কান্নার চোটে সারা দেউড়ি তোলপাড় করে তুল্লে বাঞ্ছারাম—এমন কাণ্ড করে তুললে যে, যে একটু রঙের আমেজ



'হামকো চোর' তো 'হামকো সরকারী চোর'!

ধরে এসেছেল, সেটা গেল চটে। দাওয়ানজির ভেতরে ডাক পড়ল।

"সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কত্তা উমেশ পাল জিগ্যেস করলে, 'কাঁদে কে?'

"কত্তা রঙের মুখে থাকলে দাওয়ানজিও তটস্থ হয়ে থাকত, মানে মেজাজের ঠিক থাকত না কিনা ;—ভয়ে ভয়ে বললে—'ঐ ব্যাটা চোর। সামান্য একটু মাথাটা কেটে নেওয়ার হুকুম হয়েছে হুজুরের থেকে, পাড়া তোলপাড় করছে,—কেউ যেন কখনও দেয়নি মাথা এর আগে! তা এক্ষুণি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! যাই পাঠিয়ে দিই।'

"দাওয়ানজি ফিরতেই কত্তা হাতটা একটু তুলে দাঁড়াতে হুকুম করলে, বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কাজ-কম্ম ছেড়ে বাড়ি গিয়ে বস এবার। আমি কাঁচা মাথা চেয়েছি সে বেটা খোট্টা দারোয়ানের।....কি অধিকারে সে আমার চোরের গায়ে হাত দেয়? পাঁড়ে কি করছেল? জানে না সে আমার হুকুম? আজ আমার চোর আটকাবে, কাল আমার ভারী আটকাবে, পরশু আমার জুড়ি আটকাবে, পরদিন আমার জমিদারীতে হাত দেবে—আমার খাস সম্পত্তির ওপর যদি এই ভাবে দখল বসায় সবাই, তো পাঁড়ে বেটা কি করতে আছে শুনি? তোমরাই বা কি করতে আছ?...যাও, অভি নেকালো সব!'

"চটে গেলে উমেশ পালের আবার বেশি করে মালের দিকে ঝোঁক পড়ত,—খুড়োকে বোতল আনতে হুকুম করে দিলে।

দাওয়ানজি হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, পাঁড়েজী তো সে বেটার ধাষ্টামো আর বে-আইনির জন্যে কিছু বাকি রাখে নি,—অচৈতন্য হয়ে ও-তরফের সিংদরজার সামনে পড়ে আছে, হুকুম হয় তো ধড় থেকে না হয় মাথাটা আলাদা করে আনিয়ে হুজুরে নজর দিই!'

"কত্তা কিছুই উত্তর না দিয়ে একটু গোঁজ হয়ে রইল, তারপর বললে, 'চোর বেটা কোথায়?'

"দাওয়ানজি বললে, 'বাইরেই পড়ে আছে আধমরা হয়ে, হুজুর... বেটা চীৎকার করছিল, ঠাণ্ডা করবার হুকুম দিয়ে এসেছি!'

"দশ-আনির বড় কত্তা কোথায়—অন্দরে ?"

"হৈচৈ শুনে তিনি বেইরে এসেছিলেন, এখন তেওয়ারীর এজাহার নিচ্ছেন বোধ হয়, বারান্দার সামনে বেস্তর লোক জড় হয়েছে।"

"কত্তা আবার খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল! দাওয়ানজি একবার জিগ্যেস করলে, 'তা হ'লে চোর বেটার সম্বন্ধে যা সাজার হুকুম হয় হুজুরের....'"

"কত্তা বললে, 'সাজা উমেশ পাল নিজের হাতে দেবে। হাতীশালা থেকে নতুন হাতীটা বের করতে বল, হাওদাসুদ্ধ। আমি স্বয়ং আসছি।"

স্বরূপ বাতা আর কাটারিটা রাখিয়া দিয়া দুইটা হাঁটু দুই হাতে জড়াইয়া আমার দিকে মুখ করিয়া বসিল, "হাতীর তলায় চাপা দিয়ে চোর মারা হবে—স্বয়ং কত্তা থাকবেন হাতীর ওপর—সঙ্গে সঙ্গে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল দাদাঠাকুর।

"কম করে বোধ হয় দশখানা গেরামের লোক ভেঙে পড়ল। ছেলে-মানুষ বলে খুড়ো আমায় দেখতে মানা করে দেছল, আমি চুপি চুপি গিয়ে একটা ছাতিম গাছে উঠে বসে রইলেম। দশ-আনি তরফেরও যত লোক বাইরে এসে জমা হল, দেউড়ির ছাতে মেয়েরা গিয়ে জমা হ'ল। ওদিকে দশ-আনির বড় কত্তা ভৈরব পাল গোপনে গোপনে সদর থানায় লোক ছুটিয়ে ওপর ঘরের একখানি ঘরে জানালার ধারে বসে ওপিক্ষে করতে লাগল। সেও তো বসে থাকবার পাত্তোর নয়—অত বড় অপমানটা হ'ল!

"বৈকাল হলে উমেশ পাল বাইরে এল। দাওয়ানজিকে জিগ্যেস করলে, 'ঢোল, শানাইয়ের জন্যে বলা হয়েছিল ?' হয়নি বলা—দাওয়ানজি চুপ করে রইল। কত্তা গলা চড়িয়ে বললে, বলেছি নিজে সাজা দোব, আমায় কি মেয়েমানুষের মত লুকিয়ে চুরিয়ে সাজা দিতে হবে ?....

নেবালো সব।' তক্ষুনি ঢুলি শানাইদের ডাকতে পাইক ছুটল। কত্তা হুকুম দিলে—চোরকে হাজির করা হোক।

"বাঞ্ছারামকে দু'তিনজন মিলে একরকম টাঙিয়েই নিয়ে এল। হাতীর পিঠে রূপোর হাওদাই থাকুক আর সোনার হাওদাই থাকুক, তার তো মিত্যুই দাদাঠাকুর? একবারে নেতিয়ে পড়ছে, মুখ দিয়ে আর রা সরছে না।

"কত্তা হুকুম দিলেন—চারজন বরকন্দাজ সাজগোজ পরে হাজির হবে। তোষাখানা থেকে একখানা জরির পোষাক, আর কত্তার খাস আলমারি থেকে এক বোতল বিলাতী মালেরও হুকুম হল। সাজার আয়োজনটা দেখে দেউড়ির চারিদিকে ভিড় চাপ বেঁধে উঠল।....এইবার তামুকটা একবার দিন দাদাঠাকুর, একটু পেসাদ পাই।"

স্বরূপ বেশ পুরাদমে কয়েকটা টান দিল। কলিকাটা একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "আছে এখনও খানিকটে।"

তাহার পর কলিকাটা আবার আমার হুঁকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল, "সে অনেক কথা দাদাঠাকুর, কত আর কইব। তাই বলছিলুম যে, সম্পত্তিজ্ঞান একটা জিনিষই আলাদা, কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা করলেই যে সেটা খুব টনটনে বলতে হবে তা নয়।
---হ্যাঁ, সে দিনকার কথা যা বলছিলুম—সদর থেকে খুনের খবর পেয়ে য্যাখন দারোগা এসে হাজির হল, ত্যাখন জলুসটা ঠিক দশআনি তরফের সিংদরজার সামনে। ঝালর হাওদা দেওয়া—হাতীর ওপরে হাওদার ঠিক মাঝখানটিতে জড়ির কাপড়চোপড় পরে বাঞ্ছারাম, বাবুর বোতলের মাল খেয়ে জয়জয়কার করতে করতে রূপোর ডিবেটা যতদূর হাত যায়, মাথার ওপরে তুলে ধরেছে—চারপাশে চারটে সাজগোজ-পরা বরকন্দাজ আসাসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে। নীচে দু'খানা গেরামের যত ঢুলী আর শানায়ী পেল্লায় জোরে নহবৎ বাজিয়ে চলেছে।

"দশ-আনীদের দেউড়ি ঘুরে, সারা বাতাসপুরটায় বারহুই চক্কোর দিয়ে, জলুসটা পোড়ো শিবমন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে



রূপোর ডিবেটা যতদূর হাত যায়, মাথার ওপরে তুলে ধরেছে

থেকে বাঞ্ছারামসুদ্ধ হাতীটা মাঠে নামিয়ে দশ-আনীদের জমির পাশেই ছ-আনীদের যে একটা চাকলা আছে, তার প্রায় বিঘে পাঁচ

ছয় ঘেরে মাহুত আর একটা চক্কোর দিলে; হাতীর পেছনে পেছনে একটা লোক চুণের দাগ দিতে দিতে চলল। বাঞ্ছারামের নাতি-নাতকুড়েরা আজ পর্যন্ত সেটা ভোগদখল করছে। দশ-আনীদের জমির ঠিক লাগোয়াই, দাদাঠাকুর, যেন ওরা কখন ভুলতে না পারে আর কি।

"তেওয়ারীর কাঁচা মাথাটা নিয়ে আসতে পারে নি বলে কত্তা পাড়েজীর ওপর একটু চটে গেছল; তবুও পঞ্চাশটা টাকা বকশিস করলে। নৈলে যে বড় অধম্ম হয় দাদাঠাকুর,—সে-বেচারী চেষ্টার তো কিছু কসুর করে নি..."

[১৩৪৯]

টেলিগ্রামের দৌত্য

সংসার-কলেজ

সর্বাণীকুমার একদমে ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এ, বি-কম, এম-এ, বি-এল এবং পি-এইচ্-ডি পাস দিয়া যখন পাণ্ডিত্যের একটি জটিল প্রহেলিকা হইয়া বাহির হইয়া আসিল, সংসারের তরফ হইতে প্রথম তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন একটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার পিতা। এটিকে শেষ অভিনন্দনও বলা চলে, কারণ ইহার পরে সংসার উদাসীন হইয়াই রহিল এবং বিশেষ করিয়া চাকরীর বাজারে সর্বাণী হাজার হাজার রকমে নিজের পরিচয় দিয়াও সে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারিল না। তখন শ্বশুর বলিলেন, "এ কাজের কথা নয় বাবাজি, তোমার ও প্রেস্টিজ্...প্রেস্টিজে পেট ভরবে না, ঢুকে পড আমার আপিসে, কপাল ঠুকে।"

আজ এক বৎসর সর্বাণী এই মার্চেন্ট আপিসে কাজ করিতেছে। উন্নতিও করিতেছে—একে বড়বাবুর জামাই, তায় পেটে বিদ্যাও আছে—তবে শ্বশুরের বড় কড়া নজর, বলেন, "না, কাজ শেখবার বয়েস এটা, ফুর্তির ঢের সময় আছে।" কাজে ঢুকিবার পর মাত্র একবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিয়াছিল; শ্বশুর বলেন, "এখন ঐতেই সন্তুষ্ট থাক। আর শ্বশুরবাড়ির খোদ শ্বশুরটিকে তো অষ্টপ্রহর দেখতেই পাচ্ছ, যাহোক একটা সান্ত্বনা তো?"

জীবনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ রসিকতা—এসবের ধার দিয়া বড একটা যান নাই; কোথায় অসঙ্গতি হয়, ভুলভ্রান্তি হয়—বিশেষ খোঁজ রাখেন না, স্থূল বপুখানি পরতে পরতে আন্দোলিত করিয়া হাসিয়া উঠেন।

মাস ছয়েক হইল একটি কন্যা হইয়াছে—অনেক দিন হইতে একবার যাওয়ার জন্য সর্বাণী উসখুস করিতেছে। আপিসের প্রবীণদের তাগাদায় বড়বাবু রাজি হইয়াছেন—চার দিনের মেয়াদে। সাহেব কি একটা ব্যারাম

সারিবার জন্য বিলাতের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস বাথ (Bath) নামক সহরে গিয়াছে, শীঘ্রই আসিবে। সে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই সর্বাণীর হাজির হওয়া চাই।

সর্বাণীর গাড়ি দুটো-ছাপ্পানয়! ঠিক হইয়াছে আড়াইটে পর্যন্ত আপিসে থাকিবে. তাহার পর ট্যাক্সি:ত ছুট দিয়া শিয়ালদহে গাড়ি ধরিবে। সর্বাণী এ-বহি সে-বহি উল্টাইয়া খানিকটা কাটাইল, একটা মোটা লেজারে ক্রমাগতই ভুল লিখিয়া খানিকটা কাটছাট করিল এবং ক্রমাগত বাম হাতের রিস্টওয়াচটির দিকে এবং ডানদিকে দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া সময়ের স্ট্রীট্ রোলারের মত গতিটার জন্য বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দেওয়াল-ঘড়িটায় ক্যালকাটা-টাইম—এদিকে রিস্টওয়াচে রেলওয়ে টাইম আজ মিলাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে যেন দুইটাই ষড়যন্ত্র করিয়া আজ হাত পা মুড়িয়া বসিয়াছে।

টেবিলের দুই পাশের দুইটি ড্রয়ার টানিয়া দিয়া আড়াল করিয়া, পকেট হইতে একটি সুগন্ধ-লিপি সন্তর্পণে বাহির করিয়া কোলে মেলিয়া ধরিল এবং ঘাড় সোজা করিয়া চোখ নীচু করিয়া পড়িতে লাগিয়া গেল। আপিসের ঠাকুর্দা অভয় চৌধুরী তাহার পেছনেই পিছন ফিরিয়া বসেন, না ঘুরিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "মুখস্থ হল ভায়া?"

সর্বাণী হাসিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল, মুখ তুলিতেই বড়বাবুর পেয়াদা একটি সেলাম ঠুকিয়া একটি শ্লিপ দিল। লেখা আছে—"Dr. Sarbani Bose, Ph. D., to see me at once." (ডক্টর সর্বাণী বোস, পি-এইচ ডি এখনই এসে দেখা করুন)—বড়বাবু জামাইয়ের শ্রেষ্ঠ খেতাবটি নামের দুই দিকে জুড়িয়া দিতে কখনও ভোলেন না।

সর্বাণী শ্বশুরের কামড়ার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি একখানা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিয়া কলম ঘসিতে লাগিলেন। বেয়ারা বাহিরে গিয়া পর্দাটা টানিয়া দিল।

বড়বাবুর লিখিতে খানিকটা সময় গেল ; শেষ হইলে বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া মলাটের উপর কর্মসমাপ্তিসূচক একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "ব্যস !" এ তাঁহার একটা চিরকেলে বদ অভ্যাস, সাহেবও শোধরাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছে। বলিলেন, "আগে কাজ, তারপর সংসারের কথা, এটুকু মনে রেখ বাবাজি।...হ্যাঁ, তাহ'লে আজ নেহাৎ সিঁদুরালিতে যাবেই ?"

সিঁদুরালি শ্বশুরবাড়ি। যুবক লজ্জিতভাবে মাথাটা একটু নীচু করিয়া লইল। বড়বাবু কহিতে লাগিলেন, "তা যাও, আর যাবে বৈকি, সে কি কথা ! তুমিও অনেকদিন যাও নি, আর তাঁরাও অনেকদিন তোমায় দেখেন নি। তোমার শাশুড়ীর খুবই ইচ্ছে। আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে ইয়াকড়া এক চিঠি লিখেছেন—সে যদি দেখ ! আরে, আমারই কি অনিচ্ছে ? তবে কি জান বাবাজি ?—চাকরি আগে ফুর্তি পরে। এই তোমাদের উঠতি বয়েস, এখন সব ভুলে উন্নতির দিকে নজর রাখবে—বকোধ্যানম্ হয়ে চিন্তা করবে কিসে দু-পয়সা আসে। এটিই মূলরে বাবা। আর মানুষ কটা বচ্ছরই বা রোজগার করতে পারে ? পঞ্চাশ পঞ্চান্ন—ধর ষাট ? তারপর কর না কত ফূর্তি করবে।...বেয়ারা ! ...ডাকলে আবার সাহেব বেটা রাগ করে। তা কি করব ? ও ছেলেদের খেলনার মত কলিং বেল আমার হাতে টেকে না। চারটে তো বেকল হয়ে পড়ে আছে। অত যদি অফিস্যাল কায়দা চাই তো দে না একটা ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টা কিনে—এস্তার পা দিয়ে খটাং খটাং করতে থাকব'খন।"

সর্বাণী হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু পকেট হইতে দস্তার মোটা চেন-আঁটা একটা প্রকাণ্ড পকেটঘড়ি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, বলিলেন, "দুটো পনের হয়েছে, ঠিক আড়াইটের সময় যে ট্যাক্সিটা দেখবি, ডাকবি। আমি ও হণ্টেজ ফণ্টেজ দিতে রাজি নই, বুঝলি ? না দেবায়, না ধর্মায়।...যা, ফুটপাথের উপর

দাঁড়িয়ে থাকগে।...কি বুঝলি? হয়েছে, হয়েছে, আর মেলা বক্তিমে দিতে হবে না,—তুমি খুব বুদ্ধিমান, এখন যাও, দয়া করে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াও গে।...বাবাজি বোধহয় ভাবছ শ্বশুরব্যাটা আচ্ছা কৃপণ তো?..."

সর্বাণী অপ্রতিভ ভাবে অর্ধস্ফুটস্বরে বলিলে, "না..."

বড়বাবু সেটুকুর দিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "...দু-এক মিনিট হণ্টেজ নিয়ে মারামারি করে। তা করি; কেন যে করি, পয়সাটা যে কি জিনিস ক্রমে টের পাবে। এইতো কুল্যে একটি মেয়ে হয়েছে; বছর বছর একটি করে আমদানী হয়ে সংসারটি জাঁকাল হ'য়ে ঘাড়ে চেপে বসুক, তখন বুঝবে—হ্যাঁ বুড়ো ব্যাটা একদিন বলেছিল বটে।"

রসিকতা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সর্বাণী লজ্জায় মাথা নত করিল।

'হ্যাঁ, তোমায় যার জন্যে ডাকা। কথাটা বলতে কেমন শোনায় বটে, কিন্তু তা ভাবলে সংসার চলে না। কথাটা এই যে—দিলাম বটে পাঁচদিনের ছুটি—তোমারও দেখছি মেয়েটির দিকে মন পড়ে রয়েছে, গিন্নীরও আগ্রহাতিশয্য কিন্তু পার তো এ থেকেও একদিন বাঁচিয়ে নিয়ে এস। সাহেব এই সময়—সেরে সুরে ভাল মন্ নিয়ে আসবে, একটা মস্তবড় সুযোগ। কি জান বাবাজী? শ্বশুড় বাড়িটা একটা বদ জায়গা, সব মেয়েদের কাণ্ড কিনা? ঠিক যে-সময়টি পয়সা কামাবার বয়েস, সেই সময়টি ও উপসর্গটিও জোটে এসে। এই করেই বাঙালী জাতটা তো গেল। সায়েবদের মধ্যে ও বালাই-ই নেই—তোমাদের ওপর শাসনও করছে দিব্যি। পি-এইচ-ডি পাশ করে তো ডাক্তার হয়েছ—ওদের বই-টইয়ের মধ্যে 'শ্বশুরবাড়ি' বলে কোন কথা পেয়েছ?—আমরা টেনে father-in-law's house করেছি, আমাদের নিজেদের কাজ চালাবার জন্যে। এইগুলি লক্ষ্য করবার বিষয়।"

লজ্জায় সর্বাণীর আর ঘাড় তুলিবার অবস্থা ছিল না।

"রাগ ক'রো না বাবাজি, শ্বশুর তোমার একটু স্পষ্টবক্তা লোক। পাশ করেছ অনেক—লেকচারও শুনেছ অনেক। কিন্তু সংসার-কলেজের প্রিন্সিপ্যালের লেকচার একটু শুনতে হবে বই কি।·· আরে চার দিনে না আসতে পার পাঁচটা দিনই পুষিয়ে নেবে, কিন্তু তার বেশি নয়।·· হ্যাঁ, এইগুলো ধর—নাও, হাত তোল। এই কুড়ি টাকা—সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া, ওদিকে যদি গাড়িটাড়ি নাই এসে পৌছুল কি কিছু হ'ল—একটা তখন ভাড়া করতে হবে তো ?...এই দশ টাকা ধর। এই ট্যাক্সি আট টাকা···হ্যাঁ, হ্যাঁ, অতই লাগবে,—শ্বশুরের কাছ থেকে টানতে হয়রে বাবা, নাও, হাত গুটিও না। আমরাও তো এক সময় জামাই ছিলাম—শ্বশুর বেটাকে কামধেনু বলেই ধরতাম··· হাঃ—হা—হা····। রাস্তায় চা জল-খাবার আছে এই পাঁচটা টাকা ধর।···সিগারেট খাওয়াটা ছেড়েছ তো ? হ্যাঁ. ওটা প্রথমত বড় অপকারী, আর দ্বিতীয়ত—সেরেফ বাজে খরচ—না দেবায়, না ধর্মায়।···প্রথম মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে ধরবে সব, একটু নেবে ঘোষ এণ্ড সন্সের ওখান থেকে একটা কিছু যাহোক সোনাদানা নিয়ে যেও। এই নাও পঞ্চাশটি টাকা···দেখেছ ? ব্যাটা নবাবপুত্তুর আবার হাত গুটোয়। এদিকে বেয়ারা ব্যাটাও হাঁ করে রয়েছে—কোথায় যাচ্ছ খোঁজ নিতে কি বাকি রেখেছে মনে কর ?····এই ধর একটা টাকা। সেখানে মেয়েরা খাওয়ার জন্যে ধরবে—কেন বোকার মত নিজের গাঁট থেকে পয়সা খরচ করবে ? রাখ এই কুড়িটা টাকা।— আমাদের ঠাকুদ্দার সেই 'জুতাকা বদৌলত' খাওয়াবার গল্পটা জানতো ?— এক মৌলবী ছিল—বে করলে, ছেলে হ'ল—বন্ধুরা বললে খাওয়াও ; কিন্তু সে-বেচারা পেরে'ওঠে না। শেষকালে তাগাদার চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দিলে একদিন সবাইকে ঢালোয়া নেমন্তন্ন করে। সবাই জুতো ছেড়ে ঘরে গিয়ে বসে হাসিতামাসা, গল্পগুজব করতে লাগল। যখন আর কেউ বাকি নেই, মৌলবীসায়েব সবার বাছাবাছা জুতোগুলো বাজারে নিয়ে গিয়ে···"

হাসির মধ্যেই বেয়ারা আসিয়া বলিল, "ট্যাক্সি হাজির।"

বড়বাবু বলিলেন, "তাহ'লে ওঠ বাবাজি, আর দেরি করা নয়। থাক্ থাক্, আর প্রণাম করতে হবে না। আমার মাথায় যত চুল আছে তত বছর পরমায়ু হোক—তোমার গিয়ে, টাক পড়বার আগে যত চুল ছিল।—হাঃ—হা—হা—এস বাবা, স্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিও।"

কলেজের দৃশ্যান্তর

সিঁদুরালি গ্রামটা কলিকাতা হইতে একশত ক্রোশের মাথায়, রেল স্টেশন হইতে ছয় ক্রোশ, পোস্ট আফিস হইতে চার ক্রোশ। রেল নৌকা আর গরুর গাড়িযোগে পৌঁছিতে হয়, গোটা চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়া যায়। সেবারে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাণী নাক-কাণ মলিয়াছিল—আর ও মুখো নয়।...

ভোরে রেলগাড়ি হইতে নামিয়া শ্বশুর মহাশয়ের আদেশ মত একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিল। স্টেশনে লোক, গাড়ি মজুত ছিল—সে কথাও জানাইয়া দিল। তাহার পর দীর্ঘ সাত ঘণ্টা রাস্তার ঝাঁকানি, দোলানি, ধুলা, তৃষ্ণা, রোদ—সমস্ত অত্যাচার একখানি মিলনোৎসুক মুখের চিন্তায় সহ্য করিয়া যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল—তখন বেলা একটা হইয়া গিয়াছে।

গল্পগুজবের মধ্যে স্নানাহার সারিতে প্রায় তিনটা হইয়া গেল। তাহার পর পান চিবাইতে চিবাইতে বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। বড় শালাজ গল্প করিতে করিতে দুয়ার পর্যন্ত আসিল এবং একটি মিষ্ট হাস্যের সহিত সর্বাণীকে সব ছাড়িয়া আগে একটি যুৎসই নিদ্রা দিবার পরামর্শ দিয়া বিদায় লইল।

ওদিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সেটা যাহাতে সম্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা

করিল। জুতাজামা ছাড়িয়া পালঙ্ক আশ্রয় করিতে না করিতেই মাখনের মত কোমল, ঢলঢলে একটি কচি মেয়েকে কোলে লইয়া তাহার স্ত্রী সুহাস ব্রীড়াজড়িতপদে ঘরে প্রবেশ করিল।

দু'জনেই পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুহাস হাসি হাসি মুখখানা লজ্জায় বাঁকাইয়া নীচু করিল। অনেকদিন পরে দেখা, তাহার উপর কোলের এই নূতন সম্পদটি,—তাহার বড়ই জড়িমা বোধ হইতেছিল। দৃশ্যটা সর্বাণী খানিকটা উপভোগ করিল, তাহার পর বধূকে কাছে টানিয়া লইয়া বাঁ-হাতটা তাহার কাঁধের উপর রাখিল, দক্ষিণ হস্তে কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহার নধর ঠোঁটে—পিতৃত্বের একটি স্নেহনিদর্শন দিল, তাহার পর বলিল, "বড় চমৎকার হয়েছে, না?"

সম্মুখে হইতে স্বামীর পাশে আসিয়া সুহাসের লজ্জাটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল; খুকীর মুখের পানে চাহিয়াই বলিল, "তোমার মতো মুখ হয়েছে, চমৎকার তো হবেই! সবাই বলছে বাপ-মুখো মেয়ে, খুব ভাগ্যবতী হবে। ঠিক তোমার মত আদল হয়েছে।"

সর্বাণী হাসিয়া বলিল, "যদি তোমার কথাই মানতে হয় তো অস্তুত বেচারার একটা দুর্ভাগ্য এই যে, মার অমন মুখ না পেয়ে বাপের এই কাঠখোট্টার মতো মুখ পেয়েছে।" তাহার পর আর একটু ঝুঁকিয়া বলিল—"সত্যি বলছি চোখ দু'টি অবিকল তোমার মত।"

শিশুটি এই সুযোগে বাপের পকেটস্থ মনিব্যাগটি অল্পায়ত্ত আঙুলের দ্বারা যতটা সম্ভব বাগাইয়া ধরিয়াছিল, একটা টান দিয়া সেটাকে মুখে পুরিবার চেষ্টা করিল। সুহাস হাসিয়া বলিল, "বাপের উপর ডাকাতি হচ্ছে?"—বলিয়া কন্যাকে স্বামীর বক্ষে তুলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও, বমালশুদ্ধ ডাকাত ধরে দিলাম—বকশিস?"

সর্বাণী কন্যাকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিল। বধূকেও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভেজান দরজার বাহির হইতে কাংস-নিন্দিত

স্বর উঠিল, "তা বলি জামাইবাবু, এখন মা-ষষ্ঠীর কিরপেয় সুভালাভালি একটি ভেঙে দুটি হ'ল, আমাদের বকশিস…"

"ঝি!"—বলিয়া সুহাস মুখে আঁচল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তোর যে আর তর সয়না ঝি—কদ্দিন পরে দুটিতে…."

কণ্ঠস্বরটি শ্যালিকা সুভাষের; তাহারও যে বিশেষ তর সহিতেছিল এরূপ মনে হয় না, কারণ সে দুয়ার পর্যন্তও খুলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, "আমাদের সবার বকশিস বাকি—মেয়ের বাপ হওয়া চাড্ডিখানি কথা নাকি?…"

ঝি-ও হাসিতে হাসিতে তাহার অনুসরণ করিল। ঝি আসিতে সুহাস ঘোমটাটা কপালের নীচে নামাইয়া দিল। সর্বাণীর ঠোঁটে একটি বেশ সরস বিদ্রূপ আসিয়াছিল, সেটি প্রয়োগ করিবার পূর্বেই খুকী ঝিকে দেখিয়া মায়ের কোল হইতে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া বলিল "ডুডু।"

ঝি বলিল, "নারে ক্ষেপী, জুজু নয়, বাবা—এইতো কোলে উঠেছিলি; বাবা চুমো খায়, গয়না দেয়…ওমা সত্যিই তো! কই পেরথোম মেয়ে মুখদেখানি সোনা দানা কই? আর তোমরাও তো আচ্ছা মা-মাসী বাপু, তেহন্থে নিজের কথাই পাঁচকাহন করছ, মেযেটা কথা কইতে জানে নি বলে আর সে নিজের নেয্য পাওনা পাবে নি গা!…"

সুভাষও যোগ দিল, "তাই তো! আমি ভেবেছি দিদি প্রথমে এসেছে, নিশ্চয় আদায় করে রেখেছে!…তুই যে ভাই মেয়ের কথাও ভুলে ব'সে থাকবি এ কেমন করে জানব?"

সুহাসের দেওয়ার মত কোন জবাবদিহি ছিল না। আসল কথাই হইতেছে—শেখান থাকিলেও সে অনেকদিন পরে স্বামীকে দেখিয়া আদায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সর্বাণীর ইঙ্গিতমত পকেট হইতে

চামড়া দিয়া মোড়া একটা কৌটা আনিয়া তাহার হাতে দিল। সর্বাণী বোতাম টিপিয়া কৌটাটা খুলিয়া একটু লজ্জিতভাবে সুভাষের হাতে দিল। মাঝখানে একটি পাথরবসান লকেটযুক্ত একগাছি সোনার হার।

সুভাষ উৎফুল্লভাবে খুকীর গলায় পরাইয়া একটু দূরে সরিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, বলিল, "কি চমৎকার মানিয়েছে দেখ দিদি।... বোসজামশাই, তোমার পছন্দ আছে, আমি পরোয়ানা দিলাম।"

ঝি-ও আহ্লাদের চোটে খুকীকে বুকে চাপিয়া একমুখ হাসিয়া হারটা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সর্বাণী আর সুহাস, দুজনেই লজ্জায় ঘাড়টা নীচু করিয়া আড়চোখে সন্তানের বর্ধিত শ্রী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুভাষ খুকীকে কোলে লইয়া সংবাদটী বাড়িতে রাষ্ট্র করিতে ছুটিল। ঝি-ও অনুসরণ করিল।

খানিকক্ষণ ঘরটি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শেষে সুহাসই কথা কহিল,—অনুযোগের স্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "দেখ তো, মিছে আমায় অপ্রস্তুত করালে।"

সর্বাণী তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "সরে এস, কেন বল তো?"

"এনেছিলে তো আগে হারটা বের করে দিলেই হ'ত। ঠাট্টার চোটে আমায় কি আর কেউ টেঁকতে দেবে?"

সর্বাণী বলিল, "সাজা কি তোমার একটু হওয়া উচিত নয়?"

সুহাস বিস্মিতভাবে চাহিতে বলিল, "যেমন ভাবে আমায় সব কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলে। আমিই কি কম লজ্জায় পড়লাম?"

সুহাস রাগিয়া বলিল, "ইয়ার্কি নয়, মিথ্যে কথা বলে এখন তোমায় সামলে নিতে হবে।"

"মিথ্যে কথাটা বুঝি ইয়ার্কির বাইরে হল?...তা কি বলতে হুকুম হয়?"

"বলবে আমি তোমায় বলতে ভুলিনি। তুমি নিজেই—নিজেই...."

"শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম? বেশ তাই বলব।"

"আ:, তা কেন? বলবে, বলবে—আঃ বলনা, কি বললে ভাল হবে, আমার মাথায় আসছে না..."

সর্বাণী বিপর্যস্ত মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইল, মুখ নত করিয়া বলিল, আমায় বললে, তার উত্তর দোব; তোমায় জিগ্যেস করলে ব'লো...."

সুহাস উৎগ্রীব হইয়া কহিল, "হ্যাঁ?..."

"ব'লো এর পরেরটির বেলায় আর ভুল হবে না—" বলিয়া আদরে মুখটি চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় ভেজান দরজায় আঘাত করিয়া তাহার বোন প্রশ্ন করিল, "আসতে পারি?"

দূতের যাত্রা

দু'টা দিন এই রকমে হাসি-তামাসা, মিলন-সোহাগের মধ্যে লঘুভাবে কাটিয়া গেল। সকলে ধরিয়া বসিয়াছে—খাওয়াইতে হইবে। তাহারই আয়োজন চলিয়াছে। কর্মকর্তা সুভাষ, তাহারই হাতে টাকা। সর্বাণী প্রীতিভোজে প্রথমে একটু আপত্তি জানায়; পরে, টাকা দেওয়ার সময় যাহাতে অনুষ্ঠান-আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয় সেজন্য শ্যালিকাকে মিনতি জানাইয়া বলে, "মান অর্থ সব তোমারই হাতে সমর্পণ করলাম, সুভাষ, দেখো!"

এদিকে আপিসে শ্বশুর মহাশয় বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আজ কালকার ছেলে নিজের স্বার্থ বোঝে না, কেবল ফুর্তির দিকেই নজর। তাহাতে আবার বাড়ির মেয়েছেলেরাও হইয়াছে অবুঝ, কোথায় বুঝাইয়া সুজাইয়া জামাইকে দুইদিন পূর্বেই কার্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে, না, সব

জামাইয়ের তরফেই দল পাকাইতে ব্যস্ত। ওদের আস্কারা পাইয়াই তো সেবার ছুটির উপর সাতদিন এক্‌স্টেন্‌সন্‌ লইল।

এদিকে সাহেবের চিঠি আসিয়াছে, সে ১৬ তারিখে পৌঁছিবে। আর দিন আষ্টেক বাকি! বড়বাবু একটা টেলিগ্রামের ফর্ম উঠাইয়া লইলেন, ঠিকানার জায়গায় লিখিলেন—Dr. Sarbani Bose, Ph.D., Sadardihi, Sindurali. তাহার পর অনেকক্ষণ ভাবিয়া নীচে আরম্ভ করিলেন—Burra Sahib—এই পর্যন্ত লিখিয়াই কলম তুলিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরে নিজের মনেই বলিলেন, "না, বাবাজি ভাববেন শ্বশুর ব্যাটা আচ্ছা চামার তো—না-পৌছতেই তাগাদা লাগিয়েছে।" ডাকিলেন, "বেয়ারা!"

বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল।

"টাইপিস্ট বাবুকে ডাক একবার। আছে, না সিগারেট টানতে বেরিয়েছে?"

বেয়ারা যাইয়া টাইপিস্ট বাবুকে পাঠাইয়া দিল। সর্বাণীর সমবয়সী এবং বন্ধুও। একটু অন্যমনস্ক হইলেই দুই হাতের আঙুলগুলা টাইপ করার ভঙ্গিতে নাচিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

বড়বাবু বলিলেন, "তুমি বাপু টেবিল থেকে একটু সরে দাঁড়াও, তোমার আঙুলগুলো যেন স্বপ্ন দেখে—সেদিন অতবড় ট্রে-টা উল্টেই দিলে। সায়েব আসছে, সে খবর রাখ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি আর আটদিন...."

"হয়েছে, এই রকম হিসেব নিয়েই চাকরি করেছ। আটদিন নয়, ঠিক আটটি ঘণ্টা ধরে রাখবে, বুঝলে?—সেই যে ঝুনো ব্রাহ্মণ চাণক্য বলে গেছে—'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ'—সেটি কক্‌খনো ভুলো না। চাকরিই হ'ল ধর্ম রে বাবা। সর্বদা 'গেলুম, গেলুম' ভাবটি মনে বজায় রেখে যাওয়া চাই।...ওদিকে বন্ধুটি তো শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে

তোফা ফুর্তি মারছেন, তাঁর হিসেবে বোধহয় আট মাস হবে। কবে আসছেন চিঠি পেয়েছ? এবার কতদিন এক্‌স্টেন্‌সন নেবেন? যাবার সময় বলে গেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"বলেছে, তুমি সুকচ্ছ।...টেলিগ্রামের ফর্মটা তুলে নাও দিকিন। তোমাদের দুজনকে বাঁচাতে বাঁচাতে আমি এদিকে ঘোর মিথ্যেবাদী হয়ে উঠলাম।...লেখ Burra Sahib returned from Bath—angry—wants you at once (বড় সাহেব বাথ হইতে ফিরিয়াছেন—ক্রুদ্ধ—শীঘ্র তোমায় চান)।....হয়েছে? নীচে তোমার নাম দিয়ে দাও, এই জন্যই তোমায় ডাকা। আমার জবানি দেওয়া ভালও দেখায় না, আর বাবাজি গা-ও করবেন না, ভাবধেন শ্বশুর-ব্যাটা ভাওতা দিচ্ছে।....হ্যাঁ, ওটা much angry (অতিশয় ক্রুদ্ধ) করে দাও বরং!"

টাইপিস্ট আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "Much কথাটা ঠিক বসে না ; very লিখে দোব?"

"বসে না মানে?"

টাইপিস্ট সেই রকম ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, বোধ হয় গ্রামারে আটকায়..."

"আটকাক্‌, কথাটায় জোর আছে—বেশ আঁটা-শোটা কথা ; very ও-রকম তাগাদা দিতে পারবে না। "ভ" অক্ষরটাই কি-রকম ঢিলেঢালা দেখছ না?—যেন শুকনো ছাতুর মত।....কই, আমাদের সময় তো গ্রামারের এ রকম উপদ্রব ছিল না!...নাও, লিখে দাও। আগে বাছাধন আমার ছটফটিয়ে ফুর্তি ছেড়ে আসুন তো, পরে সামলে নেওয়া যাবে'খন।...আর মেয়ের মুখ দেখা তো হ'ল রে বাপু,—যার জন্যে এত খড়ফড়ানি, কি বল?....বেয়ারা! এই টেলিগ্রাম দিয়ে আয়! সমস্ত দিনটা কাটিয়ে আসতে পারবি তো?"

পথের মাঝে

সিঁদুরালির পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ আপিস সদরডিহিতে—পূর্বেই বলা হইয়াছে চার ক্রোশের ধাক্কা।

পোস্টমাস্টার ভবানীশংকরবাবু নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির লোক। বরাবর লেখালেখি করিয়া ভিড় হইতে সরিতে সরিতে শেষ বয়সে এই নিরিবিলি জায়গাটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। সকালে খান চল্লিশেক চিঠি আমদানি হয়, আর দুপুরের ঝোঁকে খান চল্লিশেক চিঠি পাঠানো—কাজ মোটামুটি এই। ইহার উপর কোনদিন একটা মনি অর্ডার আসিল কি গেল, কি একখানা টেলিগ্রামের হাঙ্গামা পড়িল তো ভবানীশংকর গরগর করিতে থাকেন—"পরের হ্যাপা সামলাতেই জীবনটা গেল। শেষ বয়েসটাতেও নিরিবিলিতে একটু আফিন সেবা করে কাটাব তা আর হ'তে দিলে না ব্যাটারা; সমস্ত জীবনটা তো নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিলিয়ে বাপু, আর কেন? ..."

আজ খানিকটা পাটনেয়ে আফিম সওগাত হিসেবে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে, তোয়াজ করিয়া আর খাওয়া হইল না। সমস্ত ভূ-ভারতের কাজ আজ সদরডিহিতে আসিয়া জড় হইয়াছে যেন। সকালের ঝোঁকে তিনখানা রেজেস্টারি, একখানা টেলিগ্রাম পাঠানো—তখনকার জমাট নেশা ঐতেই উবিয়া গেল। দুপুরে একখানা মনি অর্ডার! ঠিক যখন মৌতাতটি জমিয়া আসিতেছে।....কেন, আর মনি অর্ডার করিবার দিন ছিল না, সময় ছিল না? সাত ব্যাটার সাধ্য সাধনা করিয়া একটু ভাল জিনিষ যোগাড় করা গেল তো কেবলই বাগড়া, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া যে তার লইবে মানুষে, তাহার উপায়টি নাই।

ভবানীশংকর ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে হাঁক দিলেন, "গুপীকেষ্ট, বলি আছিস না গেছিস রে?"

"এই যে ঠাকুরমশায়!" বলিয়া গুপীকেষ্ট সামনেই টেবিলের আড়াল হইতে সট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একাধারে পিয়ন, স্ট্যাম্প ভেণ্ডার, সর্টার, পোস্ট মাস্টারবাবুর 'বামন' আরো অনেক কিছু। ভবানীশংকর একটু চমকিয়া বলিলেন, "হঠাৎ এমনি করে দাঁড়িয়ে ওঠে লোকে?... কোথায় যে থাকিস, তখন থেকে ডেকে ডেকে হায়রান হ'লাম..."

গুপীকেষ্টর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কোন জবাব দিল না।

"—একটু দেখিস বাব', আর যেন কোন ব্যাটা এসে না জ্বালাতন করে। বলিস, মাস্টার-মশায়ের শরীরটা খারাপ, কাল তখন এসে কাজ করে নিয়ে যাবেন।....আমি একটু চেখে দেখি জিনিসটা কেমন দিলে; কেনই যে আমায় দেয় সব খাতির করে, বলে মরবার ফুরসৎ নেই!...একটু মিষ্টি কথায়ই বলিস, না হ'লে আবার বিনি-খরচায় নালিশ করে দেবে..."

কুয়াসার উপর কুয়াসার মতো নেশাটি বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। গুপীকেষ্ট একটি লোককে খানিকটা বচসা করিয়া সরাইল। ভবানীশংকরের অভিভূত ইন্দ্রিয়ের কাছে বোধ হইল গুপী যেন একটা ফৌজকে কথার তোড়ে হঠাইয়া দিল। মুখে একটু হাসি ফুটিল, মনে মনে বলিলেন "সাবাস ব্যাটা!" এমন সময় টেলিগ্রামের যন্ত্রে শব্দ হইল, টকাটক্— টেরে—টকটক্! ছয়দিন পরে দিন বুঝিয়া ঠিক আজই!

"বলে, 'কপালে নেইকো ঘি, ভাঁড় চাঁচলে হবে কি'? দেখলি গুপী ব্যাটাদের আক্কেলখানা?....হ্যাঁ, যাচ্ছি, আর সবুর সয়না!" বলিয়া ভবানীশংকর অর্ধনিমীলিত নেত্রে মন্থরগতিতে গিয়া যন্ত্রে বাম হস্তের আঙুল দিয়া বসিলেন ও দক্ষিণ হস্তে লিখিতে লাগিলেন—Doctor Sarbani Bose Ph. D.—শেষের অক্ষর তিনটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি রকম হল? ফ্যাড্!" তারে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একই উত্তর পাইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "মরুকগে; ফ্যাড্ তো ফ্যাডই, বলে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্'—আমার কিসের মাথাব্যথা?..."

লিখিয়া চলিলেন—Sadardihi Sindurali—Burra Sahib returned from bath—muc hangry—ভবানীবাবু ওদিকে থামিতে সংকেত করিয়া মনে মনে বলিলেন, "মাক্ মাক্—এ কি রকম হ'ল। আবার হাংরি কিরে বাবা।" রিপিট করিতে বলিলেন—বিরক্তভাবে ফাঁক ফাঁক হইয়া অক্ষরগুলা বাজিতে লাগিল—m-u-c-h-a-n-g-r-y—

ভবানীশংকরের নেশায়-আচ্ছন্ন মগজে একবার হঠাৎ যা বসিয়া গিয়াছিল, এই নিঃসম্পর্ক আলাদা আলাদা অক্ষরে সেটা আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল। দুত্তোর, যত গরজ যেন আমারই" বলিয়া লিখিলেন, wants you at once—Binode—শেষ হইল।

সমস্তটা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই তিনবার প'ড়লেন। শেষে নেশার ধোঁয়া ভেদ করিয়া মুখে যেন একটু জ্ঞানের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। Hangry কথাটা নিজের বুদ্ধিমত একটু বদলাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাই তো বলি, টেলিগ্রাম নিয়ে মাথার চুল পাকালাম, আর আজ এই একটা সামান্য লাইনের মানে বুদ্ধি এড়িয়ে যাবে?—Burra Sahib returned from bath muc hangry wants you at once—Binode.

"বুঝলি গুপী? বড় সায়েব নেয়ে এসে খিদের চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না, তাই ডাক্তারকে তার করা হচ্ছে, শীগ্‌গির চলে এস।....একেই বলে তরিবৎ! সাধ করে কি বলে সাহেবের কুকুর হওয়াও ভাল?... আর আমি অভাগা একটু তোয়াজ করে একরত্তি আফিন সেবা করব সমস্ত দিনে তার ফুরসৎ হয়ে উঠল না।"

তারপর নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, "এটা কি? এম, ইউ সি—মাক্ মাক্—কই, মাক্' বলে কোন কথা কখনও শুনিনি তো! তবে কথাটা যেন জোরালো গোছের—মাক্ হাঙ্গরি! যেন খাই খাই করছে! মরুকগে, মানে তো দিব্যি বেরিয়ে এসেছে, কথায় বলে 'ভাষাসমুদ্র'—কটা কথাই বা জানি আমি? বিদ্যে তো ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত..."

গুপীকেষ্টকে বলিলেন, সিঁদুরালির বিট কাল না? যাক্, আনা দুয়েক ট্যাঁকে আসবে। আমার মাঝে পড়ে ভরি খানেক মাল স্রেফ নষ্ট সকাল থেকে—আর মালের সেরা মাল গো!...”

একটুর মধ্যেই আবার নিঝুম হইয়া পড়িলেন।

ভগ্নদূত

বাড়ীটি আনন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ প্রীতি-ভোজ। সুভাষ আর সর্বাণীর শালাদের সকাল থেকে আর ফুরসৎ নাই,—মাঝে মাঝে সর্বাণীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জরিত করিয়া যাওয়ার অবসরটুকু ছাড়া। সুহাস লজ্জায়-গরবে অলসগতি হইয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও সখীদের সহিত খানিকটা গল্প করিল, কখনও ছেলে মেয়েদের সাজগোজে মন দিল। একবার গিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিল। বৌদিদি লুচি বেলিতেছিল, বেলনটা থামাইয়া বলিল, “ওমা, তুমিও এলে ঠাকুরঝি? ঠাকুর জামাইকে দেখবে কে? আমরা সব এদিকে ব্যস্ত, তোমার ভরসাতেই চলে এসেছি···”

সুহাস আব্দারে-অভিমানের সুরে বলিল, “দেখ্‌চ মা, তোমার বৌকে?”

তিনি কড়ায় খন্তি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, ‘তোমরা কেন বাপু ওর পেছনে লেগেছ?”

ঝিয়ের আজ সবচেয়ে পায়া ভারি। সে গয়না-গোট-পরা খুকীকে লইয়া সকলেরই কৌতূহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং খুকীর বাপ এবং বাপের বাড়ি কলিকাতা নগরী সম্বন্ধে বিস্ময়কর কাহিনী সব বিবৃত করিয়া সকলের কৌতূহল দশগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাহার উপর কানে একটু খাট বলিয়া কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইতেছে না, এই ধারণার বশে দশগুণ চীৎকার করায় সে একাই বাড়িটা দশগুণ গুলজার করিয়া তুলিয়াছে।

এর উপর আছে ছেলেমেয়েদের হট্টগোল, বাড়িটিতে আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় সুখের এই ঐক্যতানের মধ্যে একটা বেসুরা আঘাত দিয়া বাড়ির সরকার মশায় রান্নাঘরের সামনে আসিয়া ডাকিলেন, "মা আছেন ?"

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই যে যেমন ভাবে কাজ করিতেছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল হইয়া গেল। গৃহিণী বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করিলেন, "কি সরকার মশাই, খবর ভাল তো ?"

"হ্যাঁ....আপনি একটু বাইরে আসুন, সদরের পানে।....তোমরা কাজ কর মা, কোন ভাবনার কথা নয়।"

গৃহিণী হাত ধুইয়া কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে বাহিরের দিকে চলিলেন। যাহাদের সান্ত্বনার কথা বলা হইল তাহারা বিহ্বলভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। একটা নিরিবিলি গোছের জায়গায় আসিয়া সরকার মহাশয় উদ্বেগ-কম্পিত হস্তে ফতুয়ার পকেট হইতে একটা টেলিগ্রামের বন্ধ খাম বাহির করিয়া শুষ্কমুখে বলিলেন "হঠাৎ এই এক টেলিগ্রাম এল মা।"

কথাটা শেষ না হইতেই—"ওমা, সে কি গো!" বলিয়া গৃহিণী ব্যাকুলভাবে সরকার মহাশয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। "কার নামে সরকার-মশাই ? আমার যে ভয়ে পেটের ভেতর হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে।"

সরকার মহাশয় তেমনি ভাবে বলিলেন, "জামাইয়ের নামে মা,—এই আনন্দের দিনে বিনা মেঘে এই বজ্রাঘাত—কি যে শুনতে হবে কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না ; আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ভট্টচাযি মশায়ের কাছে লোক দৌড় করিয়ে দিয়েছি, এসে একটা লগ্ন দেখে বলুন। সে ওদিক থেকে ঈশেন মাস্টারকেও ডেকে আনবে। ভাল সময় দেখে খুলে পড়ুক, তার পর—যেমন

হয় করা যাবে! জামাইকে আর এখন দেখান উচিত নয়। কি অক্ষণে কুক্ষণে যাত্রা করেছেন যে " আজকালকার ছেলে....”

“যা করে ফেলেছেন তার তো চার নেই, সরকার-মশাই, এখন মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষে করেন তো রক্ষে! দোহাই মা, ষোল আনার পূজো দোব, দেখো যেন.. ”

এমন সময় যে ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ঈশান মাস্টারের খোঁজে গিয়াছিল সে আসিয়া খবর দিল—ভট্টাচার্য ভিনগাঁয়ে গিয়াছেন, ঈশান মাস্টার একটু পরে আসিতেছে।

গৃহিণীর চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল! ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতি যে ভয়ানক একটা দুর্লক্ষণ তাহাতে সরকার মহাশয়েরও কোন সংশয় রহিল না! খানিকক্ষণ কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারিলেন না! তাহার পর বলিলেন, “কাজটুকু আজ হয়ে যাক মা, কাল খোলাই ভাল হবে। আপনি বুক বেঁধে থাকুন একটু—না হ'লে সব পণ্ড হবে। আমি গোবিন্দজিউর পায়ে ঠেকিয়ে খামটা বাক্সয় তুলে রাখছি আজ।”

নিরুপায়, তাহাই স্থির হইল। ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া গৃহিণী একেবারে রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন! খালি বৌ আর সুভাষই ছিল, আসন্ন বিপদের কথা তাহারা শুনিল।

ভয়ের ছোঁয়াচ তাহাদের মনেও সংক্রমিত হইয়া গেল! সুভাষ একটু পরে কিন্তু বলিল, “আচ্ছা, ভাল খবরও তো থাকতে পারে?”

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ছেলেমানুষী রাখ্ সুভাষী, তারে নাকি আবার ভাল খবর আসে। শুনলে গা জ্বলে যায়! অমঙ্গলের খবর দেবার জন্যেই তো কোম্পানী ওটা করেছে—আকাশের বাজ টেনে!”

সুভাষ একটু ভয় কাটাইয়া উঠিয়াছে, বলিল, “কেন, সেবারে দত্তদের মেজ ছেলের পাসের খবর তো টেলিগ্রামেই এসেছিল ...”

মা ধমক দিয়া উঠিলেন. "ছেলেটা বাঁচলে শেষ পর্য্যন্ত? আর জ্বালাস নি, আজকালকার মেয়ে সব যেমন ধিঁঙ্গি হয়েছে...তুমি 'গিয়ে যেন আজ কথাটা জামাইবাবুর সামনে পেড় না...গা-জুরি কথা শুনছ বৌমা?"

তিনিও দুই তিনটি সন্তানের মা, মানৎ করিতে করিতে বুকের সাহস অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। বলিলেন, "কে জানে, মা! আমার তো গুলিয়ে যাচ্ছে সব; তবে সুহাস ঠাকুরঝিকেও শুনিয়ে কাজ নেই বাপু, আজকের দিনটা যাক।"

সে দিনটা গেল। উৎসবের উপর দুইখানি বিষণ্ণ মুখের ছায়া পড়িয়া রহিল। সর্বাণী, সুহাস কাহারও মনে কিন্তু কোনো সন্দেহ জাগিবার অবসর হইল না। সুভাষ তাহার বয়সের গুণেই বোধ হয়, কাল্পনিক ভয়কে অতটা আমল না দিয়া আমোদটা সাধ্যমত বজায় রাখিল।

তাহার পরদিন ভট্টাচার্য্য আসিয়া পাঁজি দেখিলেন এবং তিন-চারখানি ভয়ত্রস্ত মুখে অনবরত দেবদেবীদের নামোচ্চারণের মধ্যে ঈশান মাষ্টার তিনবার কপালে ঠেকাইয়া টেলিগ্রামখানি খুলিলেন। প্রথমে মনে মনে পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আ মর্‌ রাক্কস নাকি।"—বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী আড়ঘোমটার আড়াল হইতে অর্ধস্ফুটভাবে বলিলেন, "সরকার মশাই, শীগ্‌গির বলতে বল না—আমার যে হাত পা কাঁপছে—ও কথা কেন বললেন উনি।"

ঈশান-মাস্টার বলিলেন, "নতুন বৌ, মানে করলে ত এই হয় যে—সায়েব নেয়ে এসে বেজায় ক্ষুধিত হয়ে পড়েছেন, তোমায় এক্ষুণি চান—তারের একটা কথার শেষের অক্ষরটা ওঠেনি—ওরকম হয়ে থাকে—টেলিগ্রাম অফিসের বিভ্রে কিনা....তার করেছে কে একজন বিনোদ। কিন্তু এ-রকম লেখার উদ্দেশ্য তো বুঝতে পারছি নি বাছা—ভূত নয়, রাক্কস নয়...."

কথাটা শেষ না হইতেই গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন—আতঙ্কে চোখ দু'টা বড় বড় করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি গো! কি অলুক্ষুণে কথা! নেয়ে এসে ক্ষিধে পেয়েছে, তেমন্য এক্ষুণি চান? শুনলে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মা, কি হবে! রাক্কসের জাত, ক্ষিধে পেয়েছে শোর গরু গেল্‌না বাপু বাকড় ভরে!...ও সরকার মশাই, একি অনর্থ? আর কারুর বিষয় কিছু লেখে নি?"

ঈশান-মাস্টার লেখার পানে চাহিয়া খুব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বলিলেন, "না, কই কর্তার বিষয় তো কিছু লিখছে না।"

গৃহিণীর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া আঁচলে মুছিয়া বলিলেন, "একি এক সর্বনেশে তার এল মা?" শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া পুত্রবধূও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। সুভাষ শুধু চিন্তিতভাবে বলিল, "কি রকম যেন খাপছাড়া কথাগুলো। তার আসতে কিছু ভুল হয় নি তো?"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, "তুই ক্ষ্যামা দে দিকিন বাছা। তোর নিজের কথাগুলোই শুধু বাঁধন-সই, আর সবই খাপছাড়া। বলে, তারে কোম্পানীর রাজত্বটা চলছে।...আমার একটা কথা মনে নিচ্ছে সরকার মশাই—সায়েব পাগল হয়ে দৌরাত্মি করছে না তো? উনি প্রায়ই বলেন—ঠাণ্ডা দেশের লোক একটুতেই মাথা গরম হয়ে উঠে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই বাড়াবাড়ি হয় নি তো?"

ভট্টাচার্য, ঈশান-মাস্টার, সরকার-মশাই সবাই একসঙ্গে বলিলেন, "সম্ভব।"

ভট্টাচার্য বলিলেন, "আমার প্রথম থেকেই যেন ঐরূপ সন্দেহ হচ্ছিল মা।"

গৃহিণী বলিলেন, "সন্দেহ নয়;—ভট্টাচাষ্যি-মশাই, ঐ ঠিক। দেখছ না, নেয়ে এসে কি রকম আবোল-তাবোল লাগিয়েছে?

জামাইয়ের ওপর ঝোঁকটা বেশি। এখন ক'দিন আর গিয়ে কাজ নেই, কি জানি—সামনে পেলেই কি একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবে। তুমি নিজে ওঁকে এক্ষুণি তার করে দাও সরকার-মশাই, পত্রপাঠ চলে আসুন। না হয় নিকে দাও—আমি মরমর—এমন কিছু মিথ্যে কথাও নেকা হবে না। তারপর ঠাণ্ডা হ'লে শ্বশুর-জামাইয়ে আবার চলে যাবেন'খন। তদ্দিন ভাল করে শান্তি-স্বস্ত্যেন করে বাবা বুড়ো-শিবের পুজোটুজো দিই।·· এখুনি ঈশেন-মাস্টার নিকে দিন।····আমার যেন গেরোর ওপর গেরো আসছে—ভালয় ভালয় সবকটিকে রেখে যেতে পারলে বাঁচি···"

ভট্টাচার্য কহিলেন, "হ্যাঁ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন একটা হওয়া দরকার।"

বধূ ফিস্ ফিস্ করিয়া শাশুড়ীর কানে কি বলিল। তিনি শঙ্কাকুল মুখে সরকার-মহাশয়কে বলিলেন "বৌমা বলছেন, জামাই নাকি কালই যেতে চান। ছুটি ফুরিয়েছে। বলছেন নাকি এবারে কাজের বড্ড ভিড়। একদিনও বেশি থাকতে পারবেন না,—উপায় ?"

সকলে চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "একটা উপায় আছে, মা,। কিছু খরচ পড়ে যাবে কিন্তু।"

গৃহিণী বিরক্তভাবে বলিলেন, "প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আর তুমি খরচের কথা ভাবছ সরকার-মশাই! শ-ত্রশো যা লাগে—বল উপায়টা কি ?"

"শ-দুশোর কথা নয়, কিছু লাগবে। পোস্টাপিসের ছাপ দেওয়া একটা নকল তার জোগাড় করতে হবে। যেন কর্তা জামাইকে তার করছেন—তোমার এখন কয়েকদিন এসে কাজ নেই। আমি নিজেই আসছি··ক'দিনের কথা লিখব ?"

গৃহিণী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "মন্দ নয়, ভাগ্যিস তোমরা

দু-তিনজন পুরুষ মানুষ একত্তর হ'লে, কথায় বলে, পুরুষের বুদ্ধি, আমি একা নারী যে কি করতুম! একেবারে দশ দিনের কথা নিকে দাও—দশ দিন এসে কাজ নেই—আমি নিজেই আসছি। তুমি নিজের হাতেই সব ঠিকঠাক করে নিয়ে এস।....ওঁরা দু'জন কি বলেন?"

ভট্টাচার্য এবং ঈশান-মাস্টারও সম্মতি দিলেন।

সুভাষের লজ্জা নাই বলিতে হয়, কহিল, "তারটা জামাইবাবুকে একবার দেখিয়ে নিলে হয় না?"

গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোর ফোড়ন দেওয়ার জ্বালায় আমার মাথা মুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয় সুভাষী, কবে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে বল দিকিন? ...খবরদার, জামাইয়ের কানে কি সুহাসের কানে যদি এর এক বর্ণও ওঠে তো তোর আর কিছু বাকি রাখব না। এতগুলো লোক হ'ল মুখ্যু, আর উনি হাইকোর্টের জজ এসেছেন।....বড় সুখের খবর, না?...উনি না-আসা পর্য্যন্ত তোমরাও সব খবরটা চেপে রাখ বাপু!"

[১৩৩৮]

রাত দুপুরে

[১]

রাত্রি দুপুর। সিনেমা থেকে একটা বোম্বাই ফিল্ম দেখিয়া ফিরিতেছিলাম। দ্বিতীয় শো'তে গিয়াছিলাম, রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

একটা নাক পর্যন্ত মুখোস-পরা ছোকরা ডাকাত যে কত কাণ্ড করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই; খুন, ডাকাতি, মোটর উল্টানো, ট্রেনের সঙ্গে কলিশন, পাহাড় থেকে ঘোড়ার পিঠের মাঝখানটিতে লাফাইয়া পড়া, তদবস্থাতেই নদী ডিঙাইয়া যাওয়া প্রভৃতি যত রকম ব্যাপার একটা বেপরোয়া লেখক এবং ততোধিক বেপরোয়া ডিরেক্টরের মাথায় আসিতে পারে, কিছু বাকি রাখিল না ছোকরা! শেষ ধরা পড়িল, একজন তাহারই মত ছোকরা অ্যামেচার ডিটেক্‌টিভ আর তাহার প্রণয়িনীর কৌশলে। সেটা আরও বিস্ময়কর।

মন্থর-গতিতে বাড়ি ফিরিতেছি। একটা চিন্তা মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। চটকল কাপড়ের কল মিলাইয়া শহরে গোটাচারেক কারখানা; যত নোঙর-ছেঁড়া বিদেশীদের আড্ডা! একে বাসিন্দাদের জীবন নিরাপদ হইয়াই রহিয়াছে, তাহার উপর এই উগ্র রকম সিনেমা-বিষ পান করাইয়া দিন দিন অবস্থা যেন আরও শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। জিনিসগুলা দেখিলাম ওদের খুব মনঃপূত। হাততালি আর "কামাল কিয়া কামাল কিয়া"র চোটে ঘর তো প্রায় ফাটাইয়া দিয়াছিল। আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়—ডিটেক্‌টিভের কৃতিত্বে তালিও নাই, সাবাসও নাই। ছিটাফোঁটা যা একটু আধটু জুটিতেছিল, তাহাও ঐ সঙ্গিনীটির ভাগ্যে।

চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছি। আগে পিছে হন হন করিয়া

সিনেমা-ফেরত সবাই চলিয়াছে। চলায় কথাবার্তায় বেশ সজীবতার লক্ষণ, সিনেমা-হল থেকে তাহাদের মনের উপযোগী খোরাক লইয়া ফিরিতেছে সব! বিড়ির ধোঁয়ায় এবং বস্তির নিজস্ব ভাষায় নানাবিধ মন্তব্যে রাস্তার হাওয়াটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পশ্চিমাই নয়, নিম্নশ্রেণীর বাঙালীও আছে মাঝে মাঝে, অবশ্য সংখ্যা কলেও যেমন কম, সেই অনুপাতে এখানেও কম। কথাবার্তার ছাপই এক অন্য ধরণের।

"স্‌সালা যেন পেল্লাদ মাইরি—এসা কড়া জান সালার!"

পাশ দিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হন হন করিয়া দুইজন চলিয়া গেল। কালো মলমলের পাঞ্জাবি গায়ে সাঁটিয়া রহিয়াছে, শীর্ণ গলা, ফাঁপা চুলের রাশিতে মাথাটা রাস্তার পাতলা অন্ধকারে উৎকট রকম ভারী বোধ হইতেছে। এই হইল নমুনা!

যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, রাস্তার গলিতে ভাগাভাগি হইয়া ভিড় পাতলা হইতে লাগিল! মিল এরিয়ার রাস্তাটা ডান দিকে চলিয়া গিয়াছে, আমি যাইব বাঁ দিকে; মোড়ের পর থেকে আমি প্রায় একা পড়িয়া গেলাম। প্রায় পনরো মিনিট হাঁটিয়াছি তখন। ওদিকটায় তবুও এক আধটা দোকানপাট খোলা থাকে, এদিকে একেবারে নিষুতি। কোন মন্তব্য কানে আসিতেছে না আর। সিনেমার বোঝাটা ধীরে ধীরে মাথা থেকে নামিয়া গিয়া এতক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়িল। কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সিনেমায় গিয়াছিলাম; বাড়িতে সবাই চিন্তিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে! পাড়ায় দুই তিনটা চুরি হইয়া গিয়াছে, একটাকে তো ছোটখাটো ডাকাতিই বলা চলে। ভাল হয় নাই কাজটা।

বড় রাস্তা দিয়া গেলে বেশ খানিকটা ঘুর পড়িবে; অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু এত রাত্রে অমন জায়গায় বাড়ির কথা মনে পড়িলে যত রকম বিপদের সম্ভাবনার খেয়াল যেন হুড়াহুড়ি করিয়া আসিয়া পড়ে,

বিশেষ করিয়া এতক্ষণ যে-সব সঙ্গীদের মধ্যে ছিলাম। একটু ইতস্তত করিয়া গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। গলিটা বেশী ভাল নয়, অনেক দূরে দূরে ম্যুনিসিপালিটির এক একটা নড়বড়ে ল্যাম্প-পোস্ট—কেরোসিন তেলের টিমটিমে আলো মাথার উপর। কয়েক পা চলিয়া আবার একটু থমকিয়া



হন হন করিয়া দুইজন চলিয়া গেল

দাঁড়াইলাম ; সত্য কথা বলিতে কি—গা ছমছম করিতেছে। ভাবিলাম, বড় রাস্তাতেই ফিরিয়া যাই, তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল লক্ষ্মীর বাড়ির কথা।

লক্ষ্মী তাহার বউকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে গিয়াছে। বাড়িতে বুড়ী মা, লক্ষ্মীর বোন আর তাহার তুইটি ছোট ছোট মেয়ে। পুরুষের মধ্যে এক আফিমখোর মামা। সমস্ত রাত ঘুমায় না, তবে ঝিমায় এবং ডাকাত পড়িলেও এই ঝিমানোর অধিক সজাগ হইতে পারে না। ঠিকা ঝিটা থাকিবে, যদি নাই আসে তো আমায় একটা ব্যবস্থা করিতে বলিয়া গিয়াছিল লক্ষ্মী। আজ সিনেমায় যাওয়াটা বড়ই ভুল হইয়া গেছে সব দিক দিয়াই।

গলি দিয়া যাওয়াই ঠিক করিলাম। একটা হাঁক দিয়া উঠাইয়া খোঁজ লইয়া যাইতে হইবে।

লক্ষ্মীর বাড়ির কথা মনে পড়ায় একটু পা চালাইয়া দিলাম। লক্ষ্মীর বউয়ের কথা ভাবিতেছি। শান্তশিষ্টটি দেখিতে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি জাহাবাজ মেয়ে। স্বামী-বাহনটিকে তো যখন যে দিকে যে ভাবে ইচ্ছা, ঘুরাইতেছে। তাহার কালো নরম নরম হাত তুইটি দেখিলে মনে হয় না, এই হাতই অত কড়া করিয়া রাশ টানিয়া ধরিতে পারে। আর লক্ষ্মীর মত একটা পুরুষ। আজ সকালে বলিয়াওছিলাম, "কি রে তুই! এত বড় কাঠামোটাই সার! বউ হুকুম করছে তো অমনই তাকে ঘাড়ে ক'রে বাপের বাড়ি ছুটতে হবে! বাড়িতে একটা পুরুষের মত পুরুষ রইল না; না হয় তোর ছোট ভাইই আসুক, তুদিন পরেই তো তার কলেজ বন্ধ হবে।"

উত্তরে শুধু ঘাড় বাঁকাইয়া বিকলভাবে হাসিল একটু, তাহার পর বলিল, "একটু মাঝে মাঝে এসে দেখে যাস শৈলেন। তোরা তো রইলি। আমার তুটো রাত্তিরের বেশি লাগবে না। এই তুটো রাত,....ব্যস্।"

লক্ষ্মীদের বাড়ি ঠিক গলির উপর বলিলে একটু ভুল হয়! গলির ঘেঁষাঘেঁষি শেষ বাড়িটার পরে একটা মাঝারি সাইজের পুকুর তাহার পর লক্ষ্মীদের দোতলা পুরানো বাড়িটা, লাগোয়া ওদেরই আমবাগান; রাস্তাটা

সেখান থেকে ঘুরিয়া চাটুজ্জে-পাড়া হইয়া আমাদের ওদিকে চলিয়া গিয়াছে। চকমিলান বাড়ি। তিন সরিকের সম্পত্তি, লক্ষ্মীদের অংশটা পিছন দিকে। অন্য সরিকেরা এখানে থাকেনা, সামনের অংশটায় তালা দেওয়া। সমস্ত বাড়িটার সদর-দরজা এক। লক্ষ্মী গলি থেকে এক ফালি রাস্তা লইয়া গিয়া ওদিকে একটা দুয়ার ফুটাইবে ফুটাইবে করিতেছে, কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না।

বউয়ের ফরমাস খাটিয়াই ফুরসৎ নাই, ও আবার দুয়ার ফুটাইবে।

একেবারে নিষুতি হইয়া গিয়াছে। মাঝে আওয়াজের মধ্যে শুধু কানে গেল, হারাণের কচি ছেলেটা বায়না ধরিয়াছে, আর তাহার মা হারাণকে শুদ্ধ জড়াইয়া উৎকট গালাগালি দিয়া তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছে।

একটা হাঁক দিলাম "জেগে নাকি হারাণ?"

উত্তর পাইলাম না; আমার ডাকে ওর ছেলে আর পরিবারের গলার আওয়াজটা হঠাৎ থামিয়া গিয়া গলিটা যেন আরও থমথম করিতে লাগিল।

একটু পরেই লক্ষ্মীদের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। আশ্চর্য, বাড়ির সদর-দরজা একেবারে হাট আদুড়!

[২]

শরীরটা আমার যেন হিম হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত কি যে করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চেঁচাইব? ছুটিয়া গিয়া হারাণকে ডাকিয়া আনিব? আগে আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়া দেখি, ব্যাপারটা কি?—বেশ মন স্থির করিয়া ভাবিতে পারিতেছি না বলিয়া কোনটাতে যে কি-রকম ফল দাঁড়াইবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রাত এদিকে সাড়ে বারোটা হইবে।....কতজন আছে? কি অস্ত্র

হাতে—এখনও আছে সব, না, কাজ সাফাই করিয়া চম্পট দিয়াছে? একটা শব্দও তো কানে আসিতেছে না।

এমন সময় কানে আসিল শব্দ। মনে হইল, লক্ষ্মীর উপরের যে ঘরটা বৈঠকখানা করিয়া ব্যবহার করে, সেই ঘরে একটা জটলা হইতেছে। একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ! বাহিরে বেশ জোর এলোমেলো হাওয়া, কতকগুলা কথা কানে আসিতেছে অসংলগ্নভাবে, কতকগুলা একেবারেই বাদ যাইতেছে, তাহার মধ্যে কতকগুলা নারীকণ্ঠের আর্ত্ত মিনতি, কতকগুলা রূঢ় পুরুষ-কণ্ঠের হুমকি-গোছের। কতকটা এই রকম—

"এই নাও আমার যা আছে—আমায় ছেড়ে দাও।"

"টাকা থাকে তো দাও।…আর নেই একেবারেই?"

একজন গলা খাটো করিয়া একটু সর্দারি-টোনেই হুকুম করিল, "চেপে রে, গলাবাজি ক'রে লোক জড় করবি শেষকালে? একে তো…"

আমার যেন কালঘাম ছুটিয়া গেল। আমি ভির্মি লাগিয়া বোধ হয় পড়িয়া যাইতাম, তাড়াতাড়ি চৌকাঠটা ধরিয়া ফেলিলাম।

মিনিটখানেক আমি বোধ হয় কিছু দেখিতেও পাই নাই, শুনিও নাই।

তাহার পর আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন একেবারে উগ্র রকম সজাগ হইয়া উঠিল। মিশ্রকণ্ঠের কতকগুলা কথা,—এক দিকের করুণ ব্যাকুলতায় আর অপর দিকের ক্রূর উগ্রতায় সুতীক্ষ্ণ—"দিচ্ছি, রক্ষা কর। রক্ষা কর!"

"দাও; নইলে এই ছুরি!"

ঠিক এই সময় উগ্রকণ্ঠে "হুসিয়ার!" বলিয়া কে যেন সেই ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিল। এইটুকু বেশ বুঝিলাম সে মামা নয়,—আফিমের নেশা কাটাইয়া ওর এতটা হুঁস হইবে যে অত জোরে "হুঁসিয়ার!" বলিতে পারিবে, এটা সম্ভব নয়। আবার একটা উৎকট রকম ধস্তাধস্তি

অসংলগ্ন গোটাকতক কথা—কে বলিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা—
"মরদ ?....ব্যস্....সাবধান !"

তাহার পরেই "ওফ্ !" করিয়া নিদারুণ একটা শব্দ হইল এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন লোকের দ্রুত ভারী পায়ের আওয়াজ;—যেমন দুদ্দাড় করিয়া পলাইতেছে সব। আমারও পা আপনা আপনি উঠিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় আওয়াজটা থামিয়া গেল, অর্থাৎ পলাতকেরা যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে, এমন বোধ হইল না। সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

বিদ্যুতের মত কতকগুলা কথা আমার মাথায় খেলিয়া গেল যেন—ধারাবাহিক চিন্তা নয়, অনুভূতি-গোছের—সাহায্যের জন্য কেহ আসিয়া পড়িয়াছে—একজন বা একাধিক—একটা খুন হইয়াছে যেদিকেই হোক—এবার এরা পলাইবে, থামিয়া গেল, বোধ হয় লাস লইয়া পলাইবে।

যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি—ভীরুতা হইয়াছিল কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হইয়াছিল, সে কথা এখানে আসে না। আমি একটা ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিতেছি মাত্র, বীরত্বের মেডেলের জন্য বিচারক-মণ্ডলীর নিকট তদ্বির নয় এটা আমার।

আমি বাহির থেকে দুয়ারের শিকল চড়াইয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম—থানাটা খুব কাছে, মিনিট পাঁচেকের রাস্তা—একেবারে সেইখানে।

বারান্দায় উঠিতেই সামনে পড়িল হেড কনস্টেবল অর্জুন পাঁড়ে। বোধ হয় কোন তদারক হইতে এইমাত্র আসিয়াছে, বেল্টটা আলগা করিয়া দিয়া গায়ের শার্টটা খুলিতেছিল, আমায় দেখিয়া দুইটা হাত অর্দ্ধোত্থিত অবস্থাতেই শার্টের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রশ্ন করিল, "মুকুর্জীবাবু যে, খবর কি আছে ? এত্তো রাতে ?"

তখন হাঁপাইতেছি, বুকটা হাপরের মত উঠা-নামা করিতেছে, বলিলাম, "খুন হয়েছে পাঁড়েজী !"

বিচলিত তো হইলই না, কতকটা শ্রান্তির সহিত বলিল, "সচ ? কোথায় ? বসেন, আরে মুকুর্জীবাবুকো একঠো কুরসি দে।"

একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম "আরে কুরসি থাক্ এখন, তুমি চট ক'রে একবার দারোগা সাহেবকে ডেকে দাও। আমি লোকগুলোকে আটকে রেখে এসেছি, আর দেরি ক'র না। বাড়িটা ঘেরাও করতে হবে।"

বোধ হয় আটকাইয়া রাখার কথায় পাঁড়েজীর একটু চাড় হইল, বাঁধা শিকার ধরাই অভ্যাস তো। হুকুম করিল, "আরে, জলদি দারোগাবাবুকে বোলা তো রে, আর ডিব্‌টিকা দশ আদমী তৈয়ার হো যাও।"

দারোগা নিতাইচরণবাবু শার্টটা গায়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করিলেন, "কি ব্যাপার মশায় শৈলেনবাবু এত রাত্রে ? কোথায় খুন ?"

সুপ্তির মধ্যে বাধা পাইয়া তাঁহার বর্তুল গোঁফজোড়া খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে।

বলিলাম, "লক্ষ্মীর বাড়িতে।"

অভিজ্ঞতাটা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। তাঁহার তন্দ্রালু ভাবটা ভালভাবে বিদুরিত করিবার জন্য একটু রংও ফলাইলাম। ডাক্তারদের যেমন রোগ সম্বন্ধে, এদেরও দেখিতেছি তেমনই অপরাধ সম্বন্ধে খানিকটা ঔদাসীন্য আছে। অবশ্য ঠিক যে গড়িমসি করিতেছে এমন নয়, তবে আমার মত 'গেল-গেল' ভাবটা আনিতে পারিতেছে না। সঙ্গেই চাকরটা ইউনিফর্ম আনিয়াছিল; পরিতে পরিতে সব শুনিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "একেবারে খোলা ছিল দোরটা ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

গোঁফজোড়াটা উঠিয়া নাকে সাঁটিয়া গেল। বলিলেন, "শেকল দিলেন,

কিন্তু অন্য দিক দিয়েও তো পালাতে পারে। আপনি কাছেই সবাইকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন না কেন?"

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য মনে মনে একটা গর্ব অনুভব করিতেছিলাম, আমার গোয়েন্দাগিরিতে শহরে কাল একটা "বাহবা" পড়িয়া যাইবে; কিন্তু তাহার মধ্যে যে এতবড় দুইটা ফাঁক ছিল, তখন কেন হুঁস হয় নাই, জানি না। একটু অপ্রতিভভাবে যা হোক একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, নিতাইবাবু প্রশ্ন করিলেন, "হুয়া তুমলোককো?"

টুপিটা চাকরের হাত থেকে লইয়া নিজের রিস্টওয়াচটা দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "চলুন। বৃথা কিন্তু।"

গোঁফজোড়াটা ঠেলিয়া নাকে চাপিয়া ধরিলেন।

আমি আসিবার প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা অকুস্থানে উপস্থিত হইলাম। বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, শিকল যেমন চড়াইয়া গিয়াছিলাম, তেমনই রহিয়াছে। নিতাইচরণের আদেশে পুলিসরা বাড়িটা ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিতাইচরণবাবু বলিলেন, "খুব সম্ভব স'রে পড়েছে, কোন রকম ক'রে লোক না ডেকে আপনি ভুল করেছেন মশাই শৈলেন-বাবু।" বলিয়া কড়া টর্চটা বাগানের দিকে ফেলিয়া একবার ঘুরাইয়া লইলেন। এমন সময় ভিতরে যেন আবার কথাবার্তা শুনা গেল। নিতাইবাবু দুয়ারের ফাঁকে একবার কান দিলেন, তাহার পরই আস্তে আস্তে শিকলটা খুলিয়া পাঁচজন পুলিসের সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমায় বলিলেন, "আপনি পেছনে থাকুন।"

এতবড় যমের মত হুকুম বা পরামর্শ আমি জীবনে কখন পাই নাই। আমার পাটা তখন বেশ কাঁপিতেছে।

দুয়ার খুলিতেই ভিতরের কথাবার্তা হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিল, "এই আলমারি তো?" •

"হ্যাঁ, এই আলমারি—চাবি?"

কথাবার্তা হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার পর ত্রস্তকণ্ঠে একজন বলিল, "এই নীচে যেন কারা এসেছে মাইরি!"

ঘরের মধ্যে ত্রস্তভাবে চলাফেরা করার আওয়াজ জাগিয়া উঠিল। একজন বলিল, "বাগানের দিকে যেন এইমাত্র টর্চের আলো পড়ল, দোর খোলা রেখে এসেছিলি নাকি?"

আমরা তখন ভিতরের উঠানে। হঠাৎ সামনের দোতলায় জানালা দিয়া দুইটা টর্চের আলো আসিয়া আমাদের মধ্যে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই টর্চগুলা নিবিয়া গিয়া অত্যন্ত ভীতকণ্ঠে চাপা আওয়াজ হইল, "পুলিস রে! সর্বনাশ!"

একটা গোলমেলে শব্দ, পলায়নের চেষ্টার মত; তখনই সেটা কিন্তু বন্ধ হইয়া গেল।

লোকগুলা যেন সাধারণ প্রাণধর্মের বশেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া আবার নিজেদের অসহায়তার কথা উপলব্ধি করিয়া থামিয়া গেল।

ওদের টর্চ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিতাইবাবুর হাতের দীর্ঘ চার সেলের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গোঁফের চেহারা অবর্ণনীয়; বজ্রনির্ঘোষস্বরে আদেশ হইল,—"সব যেমন আছ ঠিক সেই রকম থাকবে। বাড়ি কুড়িজন পুলিসের হাতে; সবার কাছেই সিক্স চেম্বার রিভলভার। নড়লেই মৃত্যু।"

একটি উত্তর হইল না উপর হইতে; সবাই যেন বজ্রাহত হইয়া অসাড় হইয়া গিয়াছে।"

হঠাৎ খানচারেক ঘর পরে দোতলার অপর প্রান্তের জানালা খুলিয়া গেল। শঙ্কিত প্রশ্ন হইল—"কে?"

"পুলিস।"

জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর পুরুষ ও নারী কণ্ঠের চাপা বিশৃঙ্খল আওয়াজ। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া ওদিককার

দোতলার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। নীচে দুইটা দরজায়ই দুইজন সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন রহিল।

[৩]

দুইটি দল সামনা-সামনি হইয়া কয়েক মিনিট নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। শেষে আমিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "তোমরা এখানে? ব্যাপার কি?"

হরিশ ব্রহ্মচারীর ছেলে দ্বিজেন বলিল, "পুলিস কেন?"

"আগে তোমরা কেন, তাই বল?"

"রিহার্সাল হচ্ছে আমাদের।"

কি প্রশ্ন করিব, সেকেণ্ড কয়েক তো মাথায়ই আসিল না। অনুভব করিতেছি, দারোগা নিতাইচরণের ছোট ছোট গোল গোল চক্ষু দুইটা আমার বাঁ রগটাকে যেন বিদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। দৃষ্টি এড়াইয়া দ্বিজেনকে প্রশ্ন করিলাম, "তা—ছুরি—রক্ষা কর—আলমারি—চাবি' এসব কেন? রিহার্সাল কি কেউ দেয় না?"

বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত দ্বিজেন বলিল, "বইয়ে রয়েছে ঐ সব কথা, আমাদের অন্য রকম বললে চলবে কেন মশাই?"

অপর একজন ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "সে কথা যদি বলেন তো ডি, এল, রায়কে বলা দরকার, যিনি লিখেছেন 'বঙ্গনারী' বইটা। আমরা নিরীহ মানুষ, আমাদের ওপর তম্বি করলে চলবে কেন?"

পিছনে একজন বলিল, "আর অন্যরকম বললে আপনারাই তো অডিটোরিয়াম থেকে গাল পাড়বেন মশাই!"

সুমিষ্ট মন্তব্যটা গায়ে না মাখিয়া দ্বিজেনের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তা এই রাত একটার সময় রিহার্সাল?"

"লক্ষ্মীদা ব'লে গেল যে বাড়িটা আগলাতে একটু; আমরা ভুগ

রিহার্সালের বন্দোবস্ত করেছি আজ আর কাল। এক সঙ্গে থাকি, এই সামান্য উপকারটুকু করব না?"

ও প্রান্তের দুয়ার খুলিয়া লক্ষ্মীর মামা বাহির হইল বোধ হয়। একটা শব্দ হইল; কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেই নিতাইচরণের সহিত চোখাচোখি হইবে। দ্বিজেনের পানে চাহিয়াই বলিলাম, "সমস্ত রাত ধরে এই খুনে ফুল রিহার্সাল! থানার দারোগা পুলিস পর্যন্ত টেনে হাজির করা! একে তো দিবারাত্রির মধ্যে একটু আরাম কাকে বলে, ওঁরা জানতেও পান না।"

এইবার একটু হাসিয়া পিছন ফিরিয়া বলিলাম, "পাগলামি নয়? এমন উদ্ভট কাণ্ড দেখেছেন দারোগাবাবু?"

নিতাইচরণের গোঁফে নাকে এক হইয়া গিয়াছে। আমার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, "ওর চেয়েও বেশি উদ্ভুটে কাণ্ড আজ দেখলাম মশাই শৈলেনবাবু।"

সাঙ্গোপাঙ্গদের অনুগমন করিতে হুকুম করিয়া গটগট করিয়া নামিয়া গেলেন।

[১৩৪৭]

বাতের মহৌষধ

[১]

শ্বশুরের চিঠি আসিয়াছে—

"বাবাজি, নিত্য আশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তদনুযায়ী ইহার সহিত অপর একখানি কাগজে তোমার বন্ধুর 'বাত-শক্তিশেল'এর জন্য প্রশংসাপত্র পাঠাইতেছি; কিন্তু...."

জামাতা চিঠি ছাড়িয়া আগে প্রশংসাপত্রটাই তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল। লেখা আছে—

"আজ আট বৎসর যাবৎ উগ্র রকম বাতে আক্রান্ত হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছিলাম। চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি রাখি নাই। আমেরিকা-ইউরোপের একেবারে নবীনতম ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া ইউনানি, টোটকা, স্বপ্নাপ্ত—কিছুই বাকি রাখি নাই। জলের মত অর্থব্যয় হইয়াছে, ফল কিছুই হয় নাই। অবশেষে আমার এক বাতজর্জরিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট আপনার 'বাত-শক্তিশেল'-এর প্রশংসা শুনিয়া ঔষধটি আনাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই যে আশ্চর্য ফল পাইয়াছি তাহাতে আপনার ঔষধের একমুখে প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। কলির ধন্বন্তরি এতদিন একটা কথার কথা ছিল, আপনি সেটাকে সার্থক করিয়াছেন। আমাকে অবাধ গতিতে চলাফেরা করিতে দেখিয়া আমার কয়েকটি বাতগ্রস্ত বন্ধু আপনার ঔষধের জন্য নিতান্ত অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন। বাতে পঙ্গুত্বের অবস্থায় অধৈর্য হওয়া কিরূপ সংকটজনক জানেনই, সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া ফেরৎ ডাকেই আর এক ডজন শিশি ভি-পি-পি যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

বিনীত

রহিমগঞ্জ — শ্রীরামসদয় সেনগুপ্ত (রায় বাহাদুর)

জিলা মুর্শিদাবাদ — রিটায়ার্ড সবজজ"

আর একবার পড়িয়া লইয়া পরেশ মূল চিঠিখানির বাকিটুকু পড়িতে লাগিল।—

"—কিন্তু বাবাজি, তোমার প্রেরিত দুইটি শিশিই নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়াও বিন্দুমাত্রও উপকার পাই নাই। অতএব, তোমার বন্ধুকে এতৎসহ প্রেরিত প্রশংসাপত্রখানি দিও, কিন্তু ঔষধ যেন আর না পাঠান হয় সে বিষ য় সতর্ক করিয়া দিও। শুধু তাহাই নয়, তোমার বন্ধু মহলে যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে এরূপ বোগাস্ ঔষধ চালাইয়া গৃহস্থকে—বিশেষ করিয়া বাত-পীড়িত নিরুপায় গৃহস্থকে প্রবঞ্চিত করিবার অতি নীচ মনোবৃত্তি রাখে ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলাম। এরূপ বন্ধু বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ঔষধ সেবন করিয়া তিলমাত্র উপকার তো পাই নাই-ই, অধিকন্তু মনে হইতেছে এদানি ব্যাধিটার প্রকোপ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তোমার বন্ধুর অনুরোধ,—তুমি ক্ষুণ্ণ হইবে, সেই আশঙ্কায় প্রশংসাপত্রটি দিলাম, কিন্তু মনে মনে বুঝিতেছি একটি নিতান্ত গর্হিত কার্য করা হইল। পূর্বজন্মের না জানি কতই পাপের ফলে আজ প্রায় বৎসরাবধি আমি বাতে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, আবার এই জন্মে ঐ রোগকে ভাঙাইয়াই পাপের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছি, অদৃষ্টে যে কি আছে জানি না। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ,—আমি বাতে জবুথবু, ওদিকে এক জন সেইটাকেই মূলধন করিয়া, প্রশংসাপত্র লিখাইয়া পরম উৎসাহে রোজগারের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ঘোর কলি নয়তো কি ?

"যাই হোক, তুমি যত শীঘ্র পার এরূপ বন্ধুকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিও।

"বিপদ একা আসে না। তোমার শাশুড়ীর এক দূরসম্পর্কের পিসতুত ভগ্নীর স্বামীর চাকরি গিয়াছে। কোন এক সাহেব-বাড়িতে কাজ করিত। লোকটা খুব ধড়িবাজ, এক দিনও বসিয়া থাকিবার পাত্র নয় ; চাকরি যাইবার কয়েক দিনের মধ্যেই একটা স্বপ্নাদ্য বাতের মাদুলি পাইয়া

বসিয়াছে। কি করিয়া সন্ধান লইয়াছে আমি এক বৎসর হইতে ভুগিতেছি। তাহাকেও প্রশংসাপত্র দিতে হইবে; তোমার শাশুড়ীর বোন অতিরিক্ত কাঁদিয়া কাটিয়া তোমার শাশুড়ীকে লিখিয়াছেন। তোমার শাশুড়ী বলিতেছেন—লোকে রিটায়ার হইয়া কত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্য অর্জন করে, আমি বাড়ি বসিয়াই যদি সামান্য এক-আধটা চিঠি দিয়া লোকের উপকার করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি তো সে সুবিধা ছাড়া উচিত নয়; তাহা ভিন্ন তাঁহার মতে দৈব মাদুলির প্রশংসা—সে এক হিসাবে দেব-সেবাই বলিতে হইবে! বিপদটা বোঝ বাবাজি।

"হাতের কাছেই আর এক উপদ্রব! এখানে রসময় সরকারের ছেলে বছর-তিনেক নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় ঘুরিয়া অবধূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছে বাতটা কিছুই নয়, যোগের কয়েকটা আসন অভ্যাস করিলেই কোথায় যে পলাইবে তাহার ঠিক নাই। প্রমাণস্বরূপ বলিতেছে রামায়ণ-মহাভারতে কোথাও বাতের উল্লেখ নাই, তাহার কারণ সে-যুগে নানাবিধ যৌগিক আসনের প্রয়োগ ছিল! তোমার শাশুড়ীকে দলে টানিয়াছে এবং আমাকে আসন শিখাইবার জন্য এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে যে আমি রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি! যোগের একটা আসন দেখাইতে সে পায়ের গোড়ালি দুইটা মাথার ব্রহ্মতলে তুলিয়া বসিয়া থাকে। বলে, সব আসনই প্রায় এই রকম সহজ, শুধু একটু অভ্যাসের দরকার। এদিকে পুরুত-ঠাকুর বলিতেছেন—বেশি না পারেন মাসে গোটাছয়েক নির্জলা উপোস দিন, আর রাত্রের খাওয়াটা একেবারে ছাড়িয়া দিন। তোমার শাশুড়ীও সায় দিতেছেন।

"আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম এই সব প্রশংসাপত্র, আসন আর উপবাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমার কিছু দিন গা ঢাকা দেওয়া দরকার। একেবারে কয়েক মাসের অজ্ঞাতবাস! বাতব্যাধিটা রিটায়ার্ড জীবনের সঙ্গী—কখন বাড়িতেছে, কখন কমিতেছে, প্রাণে

মারিবে বলিয়া কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু পুরাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিষেধকের যে রকম উপদ্রব জুটিতেছে, আর পরমাত্মীয়েরা যে-রকম



শুধু একটু অভ্যাসের দরকার

যে-রকম অত্যাচার লাগাইয়াছেন তাহাতে ক'টা দিন সরিয়া থাকাই ভাল। বাতের এই মারাত্মক খ্যাতিটা কমিয়া আসিলে আবার তখন ফেরা যাইবে।

"তোমার শাশুড়ী ঠাকুরুণকে বাপের বাড়িই পাঠাইয়া দিব। সেই

সঙ্গে চপলাও দিনকতক মামার বাড়ি বেড়াইয়া আসুক। কথাটা গোপনীয়, তবে তোমায় না বলিলেই নয়। সঙ্গে যাইবার জন্য আমার একটি বিচক্ষণ চাকর চাই, তোমায় জোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। আমার চাকরটা বাহিরে যাইতে নারাজ। পূর্বে কবে এক বার হাওড়া স্টেশনের দিকে গিয়াছিল। অত লাইনের মাঝে নিজের লাইনটি বাছিয়া গাড়ি যে কি করিয়া নিজের গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে ওর মাথায় সেটা কোন মতেই ঢোকে না। ফলে বিদেশ যাওয়ার নামেই কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়।

"তুমি যথাসম্ভব শীঘ্র একটি বেশ চটপটে চাকর জোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিবে, আর কি উদ্দেশ্যে যে তোমার শাশুড়ীকে বাপের বাড়ি পাঠাইতেছি ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দিবে না।

"আর ঐ যা বলিলাম; ওরকম সাংঘাতিক বন্ধুর সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ কর।

"তোমার শাশুড়ীর মাথাব্যথা আজকাল অনেকটা কম। খগেনের ডায়েবেটিস্‌টা আবার একটু বাড়িয়াছে, মাস দুয়েকের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। শৈলজার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। লিখিয়াছে ভালই, তবে ডিস্‌পেপসিয়ায় শরীরটা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে; লক্ষ্ণৌয়ে ওর মেসোর কাছে যাইবে বলিতেছে। যাক, একটু ঘুরিয়া আসুক। তবে হ্যাঁ, তোমার বন্ধুটিকে এসব অসুখের কথা বলিয়া কাজ নাই। প্রত্যেক রোগের জন্য দুটা করিয়া শিশি পাঠাইয়া দিয়া তোমায় ধরিয়া বসিবে প্রশংসাপত্র আনাইয়া দাও। ও-ধরণের লোক সব পারে। না লোকটাকে এড়াইয়া চলিও বাবাজি!

"চাকর পাঠানোর কথা ভুলিও না। খালি একটি ঠাকুর আর একটি চাকর লইয়াই যাইব, বেশ স্মার্ট হওয়া চাই, যেন ফাঁকিবাজ না হয়।

"অত্রস্থ সমস্তই কুশল। তোমাদের কুশলদানে সুখী করিবে।

ইতি—"

[৩]

চিঠি পড়িয়া জামাতা বাবাজী একেবারে গুম্ হইয়া বসিল। আভ্যন্তরিক রে তাহার মনটা যেন একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। চিঠিটা একবার মুড়িয়া মুড়িয়া মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর আবার ভাঁজ খুলিয়া বন্ধুর সম্বন্ধে যেখানে যেখানে তীব্র, নগ্ন মন্তব্যগুলা রহিয়াছে সেগুলা পুনর্বার পড়িয়া গেল। প্রশংসাপত্রখানা পড়িয়া মনে যে একটা উল্লাস আসিয়াছিল সেটা জমিতে না জমিতেই বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল।

কারণ আছে;—মন্তব্যগুলা কোন বন্ধুর ঘাড়ে পড়ে নাই, পড়িয়াছে তাহার নিজেরই উপর। আসল কথা 'বাত-শক্তিশেল'-এর আবিষ্কর্তা পরেশ নিজেই, তবে বন্ধুর নামে কেন চালাইতেছে, অথবা যে-নামে চালাইতেছে সে-নামের কোন বন্ধু আদৌ আছে কিনা, বা শ্বশুরের সঙ্গে এত লুকোচুরির কারণই বা কি—এসব কথা তুলিতে গেলে এত অল্পে কুলাইবে না, তাই সেটা আপাতত বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম! মোট কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—ভাবেই আসুক কথাগুলা পরেশকে বিঁধিয়াছে—মাঝখানে একটা মনগড়া বন্ধুর পর্দা থাকিলেও শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্কই তো!

পরেশের প্রথমে মনে হইল কড়া করিয়া একটা উত্তর দেয়—অবশ্য কাল্পনিক বন্ধুর নিরাপদ অন্তরাল হইতে।...রাগটা ও পর্দা থেকে নামিলে মনে করিল প্রশংসাপত্রটাই ছিঁড়িয়া ফেলে,—তিন পাতার কটু রসে জড়ানো আধ পাতার প্রশংসাপত্রের আর কিসের এত মোহ? ছিঁড়িতে গিয়া কিন্তু চক্ষু দুইটা নিতান্ত অবাধ্য ভাবেই লাইনগুলার উপর আবদ্ধ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া চিঠির নিম্নে স্বাক্ষর আর ঠিকানাটার উপর। প্রশংসা মিথ্যা হোক, কিন্তু রিটায়ার্ড সব্ জজ তো মিথ্যা নয়?—রহিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—এসব তো মিথ্যা নয়। এই পরশপাথরই যে ঐ মিথ্যার রাংকে সত্যের স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

সোনার স্পর্শে মনেও সোনার স্বপ্নের রং ধরিল।...প্রশংসাপত্র ছেঁড়া চলে না; আর কড়া জবাব?—শ্বশুরকে! ভগবান্ বহু পুণ্যে অমন একটি জীব দেন।—তুমি সংসার করিবে, গোড়াপত্তন করিয়া দিল শ্বশুর, তোমার ক্ষমতা নাই, বুনিয়াদের উপর ভিৎ তুলিয়া দিল শ্বশুর,... তুমি স্বপ্নাস্ত চালাইবে?—মন, বাক্য, কায়া লইয়া তিনি হাজির আছেন—বাতগ্রস্ত কায়া, নিতান্ত তোমারই জন্য...এমন শ্বশুরকে কড়া জবাব দেয়? বরং, যদি নিজের ক্ষতি না হয় তো পারতপক্ষে মাঝে মাঝে একটু উপকারই করা ভাল...

কি উপকার করা যায়?

কেস্ হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া কেসের ডালার উপর কয়েক বার ঠুকিয়া, ঠোঁটে চাপিয়া পরেশ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। তাহার পর কৃতজ্ঞচিত্তে শ্বশুরের উপকারের সুযোগ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল—শ্বশুর সম্প্রতি একটি চাকরের জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—এই চিঠিতেই তো লিখিয়াছেন।

এই আবার এক ফ্যাসাদ! চাকর কি এখানে গাছে ফলিতেছে যে ছুট্ বলিতেই একটা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইবে? শ্বশুরের যদি একটু আক্কেল আছে! এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কোথায় চাকর, কোথায় চাকর করিয়া ফের!

উপকারের ইচ্ছাটা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ঘাড়ের উপর উপকারের তাগাদায় মনটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চিন্তিত ভাবে খানিকক্ষণ সিগারেট টানিল পরেশ, তাহার পর মনে হইল—দেখা যাক তার নিজের চাকরটা যদি একটা জোগাড় করিয়া আনিতে পারে! ডাক দিল, "রামকানাই?"

উত্তর না পাইয়া আবার একবার ডাকিল। উত্তর নাই।... মরেছে!—বেটা ঠিক কোথাও পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কিন্তু এইমাত্র

তো দুই বালতি জল লইয়া বাথরুমের দিকে গেল। কখন বাহির হইয়া গেছে? চোখে পড়ে নাই তো। এতই কি অন্যমনস্ক ছিল পরেশ?...আরও জোরে হাঁক দিল, "রামকেনো!"

ঠাকুর রান্না করিতেছিল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "রামকানাইকে কোথাও পাঠিয়েছ ঠাকুর?"

ঠাকুর দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কই, না তো বাবু।"

"দেখ তো বাইরে কোথাও আছে কিনা?"

ঠাকুর বাইরে গিয়া বিস্তর হাঁকডাক করিল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নিশ্চয় কোথাও ঘুমুচ্ছে, বাবু।"

"এই মিনিট দু-একও হয় নি বালতি নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, এর মধ্যে কখন বেরুল, কোথাই বা গেল..."

"দাঁড়ান, দেখি বাবু"—বলিয়া ঠাকুর বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একবার দেখে যান বাবু কাণ্ডটা, শীগগির আসুন।"

বাথরুমে জলে ভরা দুইটি বালতি, তাহার একটির কাণাকে বালিশ করিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া রামকানাই নিদ্রামগ্ন! গাঢ় নিদ্রায় গম্ভীর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ওঠানামা করিতেছে, বালতির জলে বীচিভঙ্গ হইতেছে, সামনের বড় বড় চুলগুলা বালতির জলে ভাসিতেছে। অনেক করিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া তুলিতে ঘুমের আমেজে বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিল, "এই নাইবার জল রেখে দিলুম।"

রাগে পরেশের বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছিল না; বলিল, "এই না তুই আধ ঘণ্টা আগে মশলা বাটতে বাটতে এক চোট ঘুমিয়ে নিলি? ....না, ঠাকুর তুমি দেখ অন্য লোক।"

"আমি তো বলছিই বাবু কদ্দিন থেকে আপনাকে—তা লোক জোগাড় করে আনলেই, আপনি বলবেন—'থাক্, বায়টান নেই, চুরি-

চামারির দোষ নেই'···চুরি!—কিছু সরাতে সরাতেই যদি ঘুমিয়ে পড়ে তো হাতে-নাতে ধরা পড়বে—সেটুকু কি ও বোঝে না?"



বাথরুমে রামকানাই নিদ্রামগ্ন

পরেশের রাগটা শ্বশুরের উপর গিয়া পড়িল। বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল, "নিজের চাকর নিয়ে এই অবস্থা, আবার ওদিকে শ্বশুরের

ফরমাস হয়েছে চাকর জোগাড় করে পাঠাও। ওঁর আর কি ; দিব্যি বাতে বিছানা কামড়ে পড়ে আছেন···যে-আক্কেলেপনার একটা সীমা থাকে····"

"কাজ যদি খালি থাকে তো····"

রামকানাই বলিতেছে! ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া—পরেশ ধমকের স্বরে প্রশ্ন করিল, "কাজ যদি খালি থাকে তো কি ?—বল, চুপ করে রইলি কেন ?"

রামকানাই কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "তাহ'লে আমার দাদাকে ভর্তি করে দেন যদি, বছরখানেক থেকে বসে রয়েছে····"

পরেশ কপালে চক্ষু তুলিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলি, "তোমার দাদা! তিনি চাকরি করবেন! বছরের মধ্যে ক-দিন চোখ খোলেন তিনি জিগ্যেস করি ?"

[৩]

পরেশ বাহিরের বারান্দায় থামে পা আটকাইয়া একটি ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়া ব'সিয়া আছে। মনটা খুব প্রসন্ন। শ্বশুরের প্রশংসাপত্র মন্ত্রবৎ কাজ করিতেছে, ছাপান অবধি 'বাতশক্তিশেলের' কাটৃতি হুহু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া শ্বশুরবাড়ির অঞ্চলে। আজ ডাকে পাঁচটি ভি. পি. সরবরাহ করিল। অবশ্য অন্য কয়েকটি প্রশংসাপত্রও আছে, কিন্তু অমন জোরাল নয়, তাদের তো আর জামাই নয় পরেশকুমার। আর নিজের গড়া প্রশংসাপত্রগুলো অতটা লাগসই হয় না, তাহাদের নামধাম কোনটারই পরেশের মস্তিষ্কের বাহিরে স্থান নাই কিনা!·· গ্রাহকদের ভগবান্ কেমন একটা সূক্ষ্ম শক্তি দেন, তাহারা মেকী নামধাম আর ঠিকানা কেমন করিয়া যেন ধরিয়া ফেলে!

রামকানাই রকের কোণটার ধারের দিকে একটা থাকে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। কাজ না থাকিলে তাহাকে আজকাল কাছেই বসিয়া থাকিতে হয় এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রভুর নিকট হইতে নস্য লইয়া নাকে দিতে হয়। নিদ্রাকর্ষণের আপাতত এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাঁচ দু-গুণে দশটি মুদ্রার ভি. পি.! শ্বশুরের প্রতি ভক্তিরসে মনটি আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে। শ্বশুর মাত্রেই ভাল, তবে ইনি যেন আবার একেবারে দেবতুল্য। বহু পুণ্যে এমন শ্বশুর মেলে। এদিকে যেমন কাটতি বাড়িয়াছে তেমনই সত্যসত্যই কোন একটা উপকার করা যাইত.... একটা উপকার অবশ্য চলিতেছে,—বধূ চপলা আজকাল পিত্রালয়েই। তাহাকে একটা চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে—সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। একে বাপ, তায় ওদিকে আবার পরমগুরু স্বামীর শ্বশুর—দুইদিক দিয়া সম্বন্ধটা গুরুতর কিনা।

ডাকপিয়ন আসিল। পরেশের চক্ষে আজকাল এ-লোকটি দেবদূতের মতই শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি অর্ডার—তাহার মধ্যে দুইটি শ্বশুর-বাড়ির অঞ্চল হইতে।

তৃতীয় একখানি পত্র খামে। খুলিয়া দেখিল শ্বশুরের লেখা। সেই এক কথা!—বাত বাড়িয়াছে, অবধূতের আসনের ভয়, প্রশংসাপত্রের তাগিদ বাড়িতেছে, না পলাইয়া উপায় নাই, একটা মস্ত সুযোগ, গৃহিণী বাপের বাড়ি গিয়াছেন ক'দিনের জন্য। ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন। সঙ্গে চপলাকেও এক রকম জোর করিয়াই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু এখন চাকর আসার অপেক্ষা। যেদিন চাকর আসিয়া পৌঁছিবে সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িবেন; কোথায় যাইবেন, কোথায় উঠিবেন সে-সব ঠিক হইয়া আছে৷—চাকর চাই, এদিকে তো চাকর খুব সুলভ, এই পনর দিনেও সংগ্রহ হইল না?

চিঠি পড়িয়া পরেশের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—আরে, 'চাকর কি রাস্তায় রাস্তায় এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যে একটাকে পাকড়াও করিয়া চালান করিয়া দেওয়া হইবে? আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক তো! বাতে ভুগিয়া ভুগিয়া কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল নাকি মানুষটার? আর এখন তাহার ফুরসৎই বা কোথায়? এই সব গাছ-গাছড়া তুলিয়া আনয়ন, ধোওয়ান, শুকান, বাটান—এই সব ছাড়িয়া ওঁর চাকরের পিছনে ঘুরিতে পার তো উনি খুশি থাকেন। স্বার্থপর। তাহা ভিন্ন দুনিয়াশুদ্ধ এই এত লোকের বাত সারিতেছে,—ঔষধ সরবরাহ করিতে করিতেও হয়রান হইয়া যাইতেছি। আর শুধু ওঁরই বাত কায়দা হইল না! মিথ্যা কথা, একটা ভান; বাত নয়, ও বুজরুকি একটা।

পরেশ ডাকিল, "ঠাকুর!"

উপস্থিত হইলে প্রশ্ন করিল, "দেখেছিলে একটা চাকর?"

"না, বলে রাখলে চলবে না। আমার রিটায়ার্ড সব্‌জজ শ্বশুর মহামহিম রায়বাহাদুর রামসদয় সেনগুপ্ত মশাইয়ের হুকুম—আজই চাই, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে...এই পরোয়ানা এসেছে।...কি বে-আক্কেলে লোক বল দিকিন! আরে চাকরের কথা বলেছ, তা আমরা করছি চেষ্টা—চারিদিকে বলে রাখা হয়েছে, এলেই দোব পাঠিয়ে—না...."

এমন সময় ধপ করিয়া পাশেই গুরুভারপতনের একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরের ছানা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। দুই জনেই ঘুরিয়া দেখিল, রামকানাই ঘুমন্ত অবস্থায় রক থেকে একেবারে নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে—জিমির বাচ্ছা দুইটা খেলা করিতেছিল—একেবারে একটার ঘাড়ের উপর। ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নাই, ঠাকুর গিয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া দাঁড় করাইল।

পরেশ এ-অবস্থায় আজকাল রাগের মাথায় চড়টা কিলটাও বাকি রাখিতেছে না। আজ কিন্তু কিছু বলিল না; শুধু প্রশ্ন করিল, "নস্তি

নিয়ে যাস্ নি কেন এতক্ষণ?" রামকানাই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরেশ কিছু বলিল না। মুঠায় মুখটা চাপিয়া চিন্তিতভাবে একটু পায়চারি করিল, তাহার পর রামকানাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিল, "তোর দাদা বাড়িতে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু?"

"বাইরে কাজ করতে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব যাবে।"

"ঘুমোয় কেমন?—শুধু খাবার সময় ছাড়া আর উঠবে না তো?.... খবরদার মিছে কথা বলবি নি।"

রামকানাই হাত দুইটা একত্র করিয়া একটু মাথা নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে মুখটা তুলিয়া বলিল, "তা মিছে কথা বলব না বাবু, ঘুমোয় একটু,—মানে আমার মতন অতটা সজাগ নয় বেশ..."

পরেশ বলিল. "যা, ডেকে নিয়ে আয়—ঠিক একটি ঘণ্টা সময় দিলাম,—এই নস্যির ডিবে নে। নস্যি নিতে নিতে যাবি, তার নাকে নস্যি দিয়ে তুলে দু-জনে নস্যি নিতে নিতে চলে আসবি— কোথাও বসা নয়, দাঁড়ান নয়, কিছু নয়—যা। এক টিপ নস্যি নিয়ে নে আগে।"

শ্বশুরকে পত্র লিখিল—

"প্রণামাবহুবনিবেদঞ্চাগে,

চাকর পাঠাইতেছি। আমার ভৃত্য রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শোনা গেল কাজে খুব তৎপর। আপনি যে লিখিয়াছেন চাকর পৌঁছিবার দিনই যাত্রা করিবেন সেই পরামর্শই ভাল।

"আমার বন্ধু ঔষধে আপনার ফল হয় নাই শুনিয়া বিশেষ মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি কয়েকটি কারণে এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে চান।

একটি কারণ, তিনি আপাতত একটি ভাল চাকরি লইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন। তবে তাঁহার বিশ্বাস একবার ঔষধে আপনার উপকার হইবেই। সেই জন্য আরও দুই শিশি এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং বিদেশে নির্ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বেশ নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। তিনি ঔষধের স্বত্ব আমায় বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি আপনি উপকৃত হন তো আমিই ঔষধটি চালাইবার প্রয়াস করিব…"

[৪]

ঠিক সতের দিবস পরে এক দিন বৈকালে পরেশ কার্যান্তর হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল বাহিরের রোয়াকে একটি লোক দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। রামকানাই ভাবিয়া গালিগালাজ দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। পরে বোঝা গেল রামকানাইয়ের দাদা। ঠেলাঠেলি করিতে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইল না, তবে তাহার শরীরের কোথা হইতে একটা লেফাফা খসিয়া সামনে পড়িল।

পরেশ তাড়াতাড়ি সেটা খুলিয়া পড়িল—

"বাবাজি,

নিত্য আশীর্বাদ জানিবে! আমি এক রকম পূর্ণভাবেই সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমার বন্ধুর 'বাত-শক্তিশেল' নিয়মিত ভাবে আবার ব্যবহার করিয়াছি বটে, কিন্তু মহৌষধটি তোমার বন্ধুর এই তৈল, কি তোমার ভৃত্য রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সে-সম্বন্ধে এখন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই পনরটা দিন নিজের হাতে মালিসের সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা প্রকারে প্রচুর অঙ্গসঞ্চালন করিতে হইয়াছে,—তাহার মধ্যে নিজের শয্যারচনা, স্নানের জল তোলা, কাপড় কাচা এমন কি জুতা পালিস করা পর্যন্ত আছে, কেননা, এক

আহারের সময় উঠিয়া আহারটুকু সারিয়া লওয়া ব্যতীত রামতারণ আর আমার অন্য কোন উপকারে বিশেষ লাগিত না। ছাত্রজীবনে যে দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারিতাম এখন সেই শক্তি প্রায় ফিরিয়া পাইয়াছি।

"যাহাই হোক তোমার বন্ধুর ঔষধের স্বত্বটা কিনিয়া রাখিও। রামতারণ পৌঁছিল কি না জানিবার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন রহিলাম। ফিরিবার সময় টিকিট কিনিতে ভিড়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পৌঁছিলেই পত্র দিবে। তোমার শ্বশ্রূ এখনও পিত্রালয়েই। অন্যান্য সংবাদ কুশল। ইতি"

[১৩৪৫]

ওরা এবং আমরা

[১]

দুইজনেই প্রায় একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল; নিমাই বলিল, "নড়নচড়ন!" ঘুটু বলিল, "নট্-নড়চড়ন নট্-কিচ্ছু।" নিমাই তাক করিয়া আঁটের গুলি ছাড়িয়া দিল।

গুলিটা ঘুটুর গুলিতে লাগিল না বটে, তবে গুলির সংলগ্ন একটা কুটোকে আঘাত করিয়া যাওয়ায় ঘুটুর গুলিটাও নড়িয়া উঠিল। নিমাই বলিল, "টোয়েন্‌টি; খাটো ঘুটু।"

ঘুটু বলিল, "আমি নট্-নড়চড়ন নট্-কিচ্ছু বলেছিলাম।"

নিমাই বলিল, "আমি আগে নড়নচড়ন বলে তবে আঁটি ছেড়েছি।"

ঘুটু বলিল, "কখনও নয়, আমি আগে বলেছি।"

"আলবৎ নয়, খাটান দিয়ে যাও। তিনবার উপরোউপরি হেরে বেইমানি করতে আরম্ভ করেছিস।"

"খবরদার, বেইমানির নাম নিবিনে নিমে! তুই কখন আগে বললি রে? মিথ্যেবাদী কোথাকার!"

"তুই মিথ্যেবাদী কাকে বললি রে?"

"তুই বেইমানি কাকে বললি?"

"আলবৎ বেইমান, হেরো বেইমান। খাটান না দিয়ে এক পা এগুতে পারবি নি।" নিমাই আগাইয়া গিয়া ঘুটুর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

ঘুটু তাহার পানে তাচ্ছিল্যের সহিত বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "লে লে, ভারি পথ-আটকানেওয়ালা হয়েছিস। এই বাড়ালাম পা, কর কি করবি, দেখি কত মুরদ।"

নিমাই তাহার কোমরের কাপড়টা ধরিয়া বলিল, "খাটান দিয়ে যা বলছি বাপের সুপুত্তুর হয়ে।"

আর বিলম্ব হইল না। "তুই বাপ তুললি কাকে রে?"—বলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ঘুটু একটা ঝটকা মারিয়া একেবারে নিমাইয়ের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর ঝাপটাঝাপটি, কিল, চড়, খামচানি, একবার এ ওপর যায়, একবার ও ওপরে ঠেলিয়া আসে। ঘামে গায়ের ধূলা কাদা হইয়া উঠিতেছে, নিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে দ্রুত আর ঘন. ফোঁসফোঁসানির মধ্যে এক আধটা যা চাপা কথা বাহির হইতেছে তাহার সামনে বাপের সুপুত্তুর অতি ভদ্র উক্তি।

নিমাই ওপরে ছিল ঘুটুকে বাগাইয়া নীচে ফেলিয়া এইবার তাহাকে থেঁতো করিবে, হঠাৎ নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘুটু নীচে থাকিয়া তাহার পাঁজরার কাছের মাংসটা কামড়াইয়া ধরিয়া এমন চাপ দিয়াছে যে, তুলাভরা গেঞ্জি গায়ে না থাকিলে মাংসটা তাহার মুখের মধ্যে গিয়া পড়িত। একটা ঝাঁকানি দিয়া ছাড়াইয়া নিমাই চীৎকার করিতে করিতেই তাহার কাঁধে পিঠে গোটাকতক ঘুষি কশাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িমুখো হইল।

ঘুটু ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়াই প্রথমে হাতের টল-গুলি দুইটা প্রাণপণ শক্তিতে নিমাইয়ের পানে ছুঁড়িল। উগ্র রাগের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একটা থান ইটের আদ্ধা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় পিছনে খানিকটা দূরে একটা খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কান্না কার রে ঘুটু?"

ঘুটু একবার ফিরিয়া দেখিয়াই দারুণ আতঙ্কে নিজের মনেই, 'পিসীমা রে!' বলিয়া হাতের ইট ফেলিয়া ছুট দিবে, কড়া হুকুম হইল, "দাঁড়া বলছি, এক পা নড়েছিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন—"

ঘুটু নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাকি ধূলা ময়লা ঝাড়িয়া

লইতেছিল ততক্ষণে পিসীমা হনহন করিয়া কাছে আসিয়া গিয়াছেন, গলার স্বরটাকে যতটা সম্ভব শান্ত, অবিচলিত রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে শুনি?"



ঘুটু ঝটকা মারিয়া নিমাইয়ের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল

ঘুটু মাটির পানে চাহিয়া বলিল, "কিছু নয়।"

পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হয়েছে কিছু, একশো বার হয়েছে।

তুই নিজের কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিস, নইলে সোনার চাঁদ ছেলে, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না, অমন পাড়া মাথায় করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে



...হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে বাড়ির দিকে...

গেল কেন?...বলি, তোমার চোখে জল দেন নি একচোখো ঠাকুর? গতর যে চুর হয়ে গেছে এদিকে! ভাব করে একসঙ্গে খেলা করতে গিয়ে

কতরকম বজ্জাতি শিখছ, আর ঐ ঢঙের কান্নাটুকু শিখে নিতে পার নি? এক কান্নাতে যে শত দস্যিবৃত্তি ঢাকা পড়বে, এ বুদ্ধিটুকু একচোখো ভগবান তোমায় দেন নি কেন? হাড় গুঁড়ো করে দিলেও ওর মারে তোমার চোখে জল আসবে না তো, ও যে নিমাই-ভাই!…চল হতভাগা, বাড়ি চল। আর এই দেখ্ কান্না আসে কি না, দেখ্ তবে—"

কান্না না শিখিতে পারার জন্য এই নিদারুণ ধিক্কারের উপর গোটা-কতক চড় খাইয়া ঘুটু ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসীমা তাহাকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে বাড়ির দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। মন্তব্যের উগ্রতার সঙ্গে তাঁহার নিজের গলা এদিকে ধাপে ধাপে উঠিতেছে। সমস্ত পাড়াটা যেন এক মুহূর্তেই গমগম করিয়া উঠিল।

[২]

ঠিক গলি নয়, তবে রাস্তাটা অপরিসর। এই রাস্তার এক দিকে নিমাইদের বাড়ি, অপর দিকে ঘুটুদের। সামনাসামনি নয়, দুইখানা বাড়ির মাঝখানে খানচারেক অন্য বাড়ি আর একটা এঁদো ডোবা। ডোবাটার পিছনে নিমাইদের বাড়ি। রাস্তা হইতে নামিয়া কচু, আশ্-শ্যাওড়ার পাতলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া পৌঁছিতে হয়।

নিমাইয়ের জেঠাইমা উঠানে বড়ি দিতেছিলেন, হাত থামাইয়া বলিলেন, "যেন নিমাইয়ের গলা শুনছি না? দেখ্ তো রে বেরিয়ে।"

অন্য কেহ বাহির হইবার পূর্বে তিনি নিজেই ব'ড়ি হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। নিমাই রাস্তা ছাড়িয়া নাচে নামিয়াছে; জেঠাইমা দরজায় দাঁড়াইয়া একটু কান খাড়া করিয়া কি যেন শুনিলেন, তাহার পর গলা উচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বলি আবার কি হ'ল? একদণ্ড আমায় তোরা সুস্থির হয়ে থাকতে দিবি কি না বল্ দিকিন?"

নিমাই চীৎকারের সঙ্গে নাকী সুর মিশাইয়া ঝাঁকিয়া উঠিল, "লক্ষ্মীছাড়া ঘুটে, বেইমান, খাটাম দেবে না ; উলটে—"

জেঠাইমার গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল, "আবার তুই ঘুটুর সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি ? যখনই নেত্য ঠাকুরঝির বাজখে'য়ে গলা শুনেছি, তখনই ভেবেছি একটা কিছু ঘটেছে। তোকে না পই পই করে বারণ করেছিলাম, 'ওরে নিমাই, ও আদুরে দুলালের কাছে যাস নি।' তা শুনবে ? আবার কান্না ! বেরো, বেরো তুই ; আর বাড়িমুখো হ'স নি।"

নিমাই সেই রকম সুরেই খিঁচাইয়া উঠিল, "ও আসে কেন ঘাড়ে পড়ে ? সেদো ! সেধে ভাব করে এসে খেলায় বেইমামি ! বললে উলটে কামড়ে দেবে, খামচে রক্ত বের করে দেবে !"

জেঠাইমা দুয়ার ছাড়িয়া হনহন করিয়া রাস্তার ধারে ডোবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েদের কণ্ঠে সপ্তমের পরেও একটা পর্দা আছে সেই পর্দায় গলা তুলিয়া বলিলেন, "ওরে অলপ্পেয়ে, তুই যে জন্মেই মা খেয়ে বসে আছিস, তোকে কি একটা মনিষ্যির মধ্যে ধরে ? তোকে তো করবেই সবাই পিটনে, তোকে না পিটলে ননীর হাতে সুখ হবে কি করে ? তোকে মারলে তো তার নালিশ নেই, তোর জন্যে তো আদালত নেই। চল বাড়ি, আমিও দিই ঘা কতক বসিয়ে। ঘুটু ! ঘুটু না হ'লে ওঁর একদণ্ড চলে না। পই পই করে বারণ করি, 'ওরে নিমে, যাস নি, তোর প্যাকাটির মত শরীর, তুই পেরে উঠবি নি ওসব দজ্জাল দাম্পাণ্ডা-দের সঙ্গে', তা গরীবের কথা বাসি না হ'লে তো—"

ঘুটুর পিসীমা ক্রন্দমান ভাইপোকে টানিতে টানিতে যখন বাড়ির রকে উঠিয়াছেন, নিমাইয়ের জেঠাইমার আওয়াজ হঠাৎ কানে গেল। থমকিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন, হাতের মুঠিটা আলগা হইয়া পড়ায় ঘুটু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। পিসীমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা শুনিলেন, তাহার পর পিছনে ঘুরিয়া পা বাড়াইলেন।

ঘুটুর মা বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি আবার এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় করে বেরিও না। অনামুখো ছেলে ঐ করে বেড়াবে চোপোর দিন, গালমন্দ খাবে না তো কি করবে ?"

ঘুটুর পিসীমা চক্ষু কপালে তুলিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যাহাতে ডোবার ধার পর্যন্ত আওয়াজটা অবলীলাক্রমে পৌছায় এইরূপ কণ্ঠে ঝংকার করিয়া উঠিলেন, "তুই বের করতে পারলি কথাটা মুখ দিয়ে বউ ? আটকালো না মুখে একটু ? (নামিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) ছিষ্টিধর ছেলে, সে হ'ল অনামুখো। তাকে পাড়ার শতেকখোয়ারীরা এই ঠিক দুপুরে খুড়বে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনতে হবে আমায় ? পরের ছেলের গতর দেখে ডাইনে ! নিজের ছেলে হ'ল প্যাঁকাটি ! সাতটা বাঘে খেতে পারবে না, তা পড়বে নজর সেদিকে ?"

পিসীমা রাস্তার ধারে পৌছিয়া গেছেন। স্রোত সামনে বহিয়া চলিয়াছে, "তা হবে প্যাঁকাটি, হবে, হবে, হবে, এই পাতোর্ব্বাক্য বলছি আমি। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া, বুড়ো মাগী কোমর বেঁধে এল ছেলে খুড়তে !"

নিমাইয়ের জেঠাইমাও, "তবে রে ? যত মনে করি কিছু বলব না—" বলিতে বলিতে পুকুর-ধার ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া উঠিলেন, এবং এর পর উভয় পক্ষের ভাষা উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া যাহা দাঁড়াইল তাহা লিপিবদ্ধ করা চলে না। ক্রমে ঘুটুর পিসীমার সঙ্গে ঘুটুদের বাড়ির অন্য মেয়েছেলেরা আসিয়া যোগ দিল, নিমাইয়ের জেঠাইমারও দম্ গলা পুষ্ট করিতে লাগিল নিমাইদের বাড়ির নানা বয়সের মেয়েরা মিলিয়া। উভয় দলই হাত-পা নাড়া ও উৎকট ভাষা প্রয়োগের ঝোঁকে এক রকম অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইতে হইতে এক সময় খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমত প্রতিপক্ষ দলে নিজের নিজের জোড়া বাছিয়া লইল। নিমাইয়ের পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট ভাই এবং ঘুটুর

চার বৎসরের ছোট ভাগ্নীর মধ্যে নানা প্রকারের ভেংচি কাটার বিনিময় হইতে লাগিল। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে ধূলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মেয়েটি বলিতে লাগিল, "তোল্ বাবা ম'লে যাক্, তোল্ মা ম'লে যাক্।"

ঘুটুদের ঝি খুব খরখরে—যেমনই ছড়া কাটায়, তেমনই হাত-পা নখ-নাড়ায়। নিমাইদের ঝি কথার দিকে আদৌ গেল না, কোঁচড় পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং ঘুটুদের ঝি অনেকক্ষণ বকিয়া গেলে মাঝে মাঝে এক এক বার 'এই নে, এই নে' বলিয়া কোঁচড়টা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল; অর্থটা বোধ হয় এই যে, সে সমস্ত বাক্যবাণগুলি নির্বিচারে ফিরাইয়া দিতেছে। এই প্রায়-নীরব প্রক্রিয়ায় ঘুটুদের ঝি যেরূপ দ্বিগুণিতভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে অনুমানটা বিশেষ মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।

নিমাইয়ের জেঠাইমার পোষা বেড়ালটা কৌতূহলবশে সঙ্গে আসিয়াছিল, ঘুটুদের কুকুরটা তাহাকে তাড়া করিয়া দিয়া গাছে তুলিয়া দিয়া উর্ধ্বমুখে আগলাইয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীদের কয়েকজন আসিয়াও সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাব মত যে যাহার দল বাছিয়া লইয়া ব্যাপারটিকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। বেচারামের মা নিমাইয়ের পিসীর পিঠটা চুঁচিয়া দিতে দিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল, "ওগো দিদি, চুপ কর, মাথা খাও আমার। কখনও কাউকে উঁচু কথা বল নি একটা, তুমি পেয়ে উঠবে না ও খাণ্ডাতের কাছে। তার পর আবার তোমার মাথার ব্যামো, বুকের ধড়ফড়ানি, কি আছে শরীরে তোমার ওদের শাপমন্যিতে? আমার মরা মুখ দেখো, চুপ কর।"

বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতেছে; দিদির উৎসাহ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইতেছে।

[৩]

ব্যাপার যখন চরমে, ঘুটুর বাবা নীরদ শনিবারের অফিস-ফেরত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল; তাহার পর ভগ্নীর কাছে গিয়া অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে, এত গোল কিসের?"

বেটাছেলের আগমনে কলহটা একটু থামিয়া গেল।

ঘুটুর পিসী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কিছু হয় নি, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। আমি উঠতে বসতে এ রকম গালমন্দ আর সহ্য করতে পারব না। তাও যত পারে না হয় আমায় দিক ঐ দুধের ছেলেটার ওপর নজর কেন? ঠাকুর দেবতার দোর ধরে কোন রকমে টেঁকে আছে, তা ডাইনীদের বুক করকর করছে, একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না। তার আগে দে আমায়—"

নীরদ অধৈর্যভাবে বলিল, "আঃ, কে কি বলেছে, তাই বল না।"

নিমাইয়ের জেঠাইমা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, গলাটা একটু আগাইয়া সুর তুলিলেন, "বলেছি আমি। বলব, একশো বার বলব, হাজার বার বলব, আমার ঐ হাজা-মরা একটা গুঁড়ো, আছে কি নেই, সে হ'ল পালোয়ান, তার হাতীর মতন গতর, তাকে সাতটা বাঘে খেতে পারে না...."

নীরদ আবার প্রশ্ন করিল, "কিন্তু উঠল কি করে এসব কথা? কি জ্বালা!"

নিমাইয়ের জেঠাইমা বলিল, "যা করে চিরকাল ওঠে, ঝগড়া করবার জন্যে যদি কেউ কোমর বেঁধে বসে থাকে।....হয়েছে ছেলের ছেলের ঝগড়া; গুলি খেলতে খেলতে নিমেকে দুর্বল পেয়ে তোমার ঐ আদুরে গোপাল—"

নীরদ, অধৈর্যভাবে বলিয়া উঠিল, "তা দেন কেন আসতে আপনার ছেলেকে—ছেলে যদি অতই ক্ষীণজীবী ?"

নিমাইয়ের জেঠাইমা নীরদের পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া "ওরে আমার বলিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গিয়া হন হন করিয়া নিজেদের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন এবং দরজার দিকে হাত দুইটা বাড়াইয়া গলা ছাড়িয়া দিলেন, "বলি অ মেনীমুখো ! বাড়ীর মেয়েছেলে যে দাঁড়িয়ে অপমান হচ্ছে গুণ্ডোর হাতে, বেরিয়ে দেখতে পার না ? শুধু যে মারতে বাকি রাখলে ! বাড়ির মধ্যে কনে-বউয়ের মত ঘোমটা দিয়ে বসে থাকলে সে ঘোমটা খোলবার মুখ থাকবে না যে চিরজন্মে !"

কথাগুলা নিমাইয়ের বাপ রসময়কে উদ্দেশ করিয়া বলা, তাহার চেহারা দেখা না গেলেও। রসময় সেই প্রকৃতির জীব, যাহাদের লেজে মোচড় না দিলে চাড় হয় না, তবে একটু মোচড় পড়িলেই যাহারা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠে। লোকটা দুয়ায়ের আড়ালে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল ও ঘুটুর পিসিমার সামনে বাহির হওয়া নিরাপদ হইবে কি না চিন্তা করিতেছিল, ভাজের ধিক্কারে বাংলা ছাড়িয়া একেবারে হিন্দী মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল, "কিস্‌কা বুকের পাটা হুয়া হ্যায় যে অপমান করেজা !"

ঘুটুর পিসীমা খপ করিয়া ভাইয়ের ডান হাতটা ধরিয়া তাহাকে মেয়েদের দলের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে নীরু, চলে আয়, ও গুণ্ডোর সামনে দাঁড়াস নি, যে ভাবে তেড়ে আসছে ! আমার অদৃষ্টে যে কি আছে !...."

হেঁচকা টানে নীরদ মেয়েদের দলের খানিকটা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল, গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "ওর মত দশটা গুণ্ডা

আসুক, নীরে চাটুজ্যে একলা তাদের মোহড়া নেবে।···বোঝা নেই সোঝা নেই, তুই যে মেয়েদের কথায় বিশ্বাস করে—"



কিস্‌কা বুকের পাটা হুয়া হ্যায় যে অপমান করেঙ্গা

রসময় আগাইয়া আসিয়া শীর্ণ বুকটা ফুলাইয়া বলিল, "আগে একটার মোহড়া সামলা নীরে, মেয়েদের দলে ঢুকে সেখান থেকে আস্ফালন করা পুরুষের কাজ নয়।"

দুই একটা এই ধরণের আলাপের পরই জমিয়া গেল। এক দিকে বোন আর এক দিকে ভাজ গোড়া থেকেই এমন দক্ষতার সহিত চালাইয়া গেল যে, মূলে যে ওরূপ উৎকট কলহের কিছু নাই সেটা না রসময় না নীরদ কাহাকেই ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর দিল না। দুইটা পরিবারই একটু কলহপ্রিয় ও কলহে দক্ষ, অল্প সময়েই নূতন পুরানো বহু কুৎসাকাহিনী একত্র হইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়ায় হাততালিটা বন্ধ করিল, কয়েকজন নীরদকে এবং কয়েকজন রসময়কে নানারকম নীতিবাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে এক রকম ঠেলিতে ঠেলিতেই বাড়ির দিকে লইয়া গেল। যতক্ষণ দেখিতে পাইল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পরকে শাসাইতে শাসাইতে তাহারা নিজের নিজের বাড়িতে গিয়া উঠিল।

* * *

জের কিন্তু মিটিল না। দুই বাড়িরই গর্জানি, আফসানি তখনও পুরা মাত্রায় চলিয়াছে। ঘুটুর পিসীমা কোট ধরিয়াছেন, হয় এ অপমানের বিহিত করা হোক, নয় তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হোক। নিমাইয়ের জেঠাইমা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। নীরদ বলিতেছে জান কবুল, এর শোধ লইবে তবে তাহার নাম নীরোদ। রসময় বলিতেছে, আজ কোন রকমে ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল বলিয়া নীরে যেন নিশ্চিন্ত না হয়।

যাহারা নীতিবাক্য প্রয়োগে ব্যাপারটা থামাইয়াছিল, তাহারা রাত্রে আবার উপস্থিত হইল। দুই বাড়িতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করিয়া স্থির হইল, ইহার একমাত্র উপায় আদালত।

নীরদের শুভার্থীরা ফৌজদারির ব্যবস্থা দিল। রসময়ের শুভার্থীরা দিল মানহানির পরামর্শ। সাক্ষী-সাবুদ সব ঠিক হইয়া গেল।

[৪]

পরদিন দুপুর-বেলার কথা। নিমাই একটা মোটা খাতা কোলে করিয়া কি লিখিতেছে, একটা চাপা আওয়াজ হইল, "নিমে!"

ঘরের পিছনেই আগাছার ঘন জঙ্গল। নিমাই ঘুরিয়া দেখিল, জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া জানালার কাছে ঘুটু। এমন কিছু অনভ্যস্ত দৃশ্য নয়, খুব বিস্মিত হইল না। ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, "এলি কি করে?"

পূর্ব্ববৎ উত্তর হইল, বাবা বেরিয়ে গেল গুপী মোক্তারের কাছে মোকদ্দমার সলা করতে। পিসিমা ক্ষীরী গয়লানীর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ক্ষীরী কাল তোদের দলে ছিল কিনা। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম।.... খেলবি?"

"না!"—বলিয়া নিমাই গোঁজ হইয়া খাতায় মন দিল।

ঘুটু প্রশ্ন করিল, "রাগ করেছিস?"

"না করবে না রাগ! হেরে গিয়ে খাটান দেবে না, তার ওপর পেটে কামড়ে দাগ পড়িয়ে দেবে! যা বলছি, নইলে জেঠাইমাকে ডাকব এক্ষুনি।....ও জেঠাইমা! এই দেখ—"

ঘুটু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝোপের মধ্যে নামাইয়া লইল। একটু পরেই পাতার মসমসানিতে বোঝা গেল সে ফিরিয়া যাইতেছে। নিমাইয়ের মুখে একটু হাসি ফুটিল। খাতা ছাড়িয়া জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "ঘুটু!"

ঘুটু ফিরিয়া তাকাইতে ,হাসিয়া বলিল, "শো'ন্, ভয় পেয়ে গেলি? জেঠাইমা কোথায়? সে বাবাকে নিয়ে দাসু উকিলের কাছে গেছে। বাবা বড্ড চটেছে কিনা তোদের ওপর....খিক্-খিক্-খিক্—"

ঘুটু বলিল, "খেলবি তা হ'লে? না হয় কালকের খাটান দিয়েই আরম্ভ করব।"

নিমাই একবার খাতার দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহভাবে কহিল, "না ভাই, হবে না। ফিচলেমি বুদ্ধি বাবার, কুড়িটা অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে গেছে, এসেই দেখবে। মানে, কোথাও যাতে না বেরুই আর কি। একে অঙ্ক আসেই না আমার—"

অঙ্কের জন্য আটকাইল না। ঘুটু অঙ্কে হুঁসিয়ার, জানালার মধ্য দিয়া খাতাটা লইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে টকটক করিয়া অঙ্কগুলা কষিয়া দিল। নিমাই নকল করিয়া লইল।

এ পাড়ায় সম্ভব নয়, ও পাড়ায় রাধারমণের মন্দিরটার পিছনে গিয়া খেলা ঠিক হইল।

যাইতে যাইতে ঘুটু পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়া বাহির করিল। নিমাইয়ের নাকের কাছে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "কি বল তো?"

নিমাই নাকটা কুঞ্চিত করিয়া দুই তিন বার ঘ্রাণ লইল, তাহার পর হাসিয়া, চোখ বড় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় পেলি রে?"

ঘুটু মোড়াটা খুলিয়া আমের গোটা পাঁচেক টক-মিঠে আচারের বড় বড় ফালি মেলিয়া ধরিল, গুড়ে মসলায় দিব্য নধরকান্তি। বলিল, "খা. পিসী ছাদে শুকোতে দিয়ে ক্ষীরীমাসীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল। ভাবলাম, নিমের জন্যে এই তালে গোটাকতক সরাই। তুই ভালবাসিস কিনা—"

এক কামড়ে অর্ধেকটা মুখে পুরিয়া নিমাই অম্লরসে মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তোর পিসীর আচারে হাত খুব মিষ্টি।"

ঘুটু একটা নিজের মুখে পুরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ নিমাইয়ের দিকে একটু ঝুঁকিয়া কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কোঁদলের গলা!"

কথাটায় কি ছিল, দুইজনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আসিয়া পড়িয়াছে। আচার কয়টা কাগজে জড়াইয়া মন্দিরের রকে রাখিয়া উভয়ে ট্যাঁক হইতে গুলি বাহির করিল।



এ—ই নট্-নড়নচড়ন নট্-কিচ্ছু—আমি ফার্স্ট—এগিয়ে আছি

ওপাড়ায় যে ঝগড়ার আওয়াজ শুনা যাইতেছিল, সেটা হঠাৎ খুব উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আঁটি ছাড়িতে ছাড়িতে ঘুটু আর একবার হঠাৎ তেমনই ভাবে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কোঁদলের গলা!"

দু'জনেই আবার ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই নিমাই রাগ দেখাইয়া বলিল, "খবরদার, হাসিয়ে অন্যমনস্ক করিয়ে দিও না বলছি ঘুটু, ভাল হবে না। এ—ই নট্-নড়নচড়ন নট্-কিচ্ছু—আমি ফাস্ট—এগিয়ে আছি—"

বিশ্বাস

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "নিন্ দা'ঠাকুর, হুঁকো এসেছেন।....বিশ্বেসের কথা যদি উঠলই তো বলব চৌধুরী বাড়ির বড়কত্তা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে বিশ্বেস জিনিষটা উঠে গেচে। তবে হ্যাঁ, গ্রাম তো সেই মসুনীই আছে?—নেই নেই করেও এখানকার লোকেদের মধ্যে সাধু-ফকিরে বিশ্বেসটা কিছু থেকেই যাবে। মসুনীর মাটির গুণ দা'ঠাকুর।"

বোমার ভয়ে কলিকাতা থেকে পলাইয়া গ্রাম আশ্রয় করিয়াছি। মনটা যখন ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, কিম্বা এক-আধটা ছোটখাট এ্যাকসিডেণ্টের অভাবে বেশি রকম হু-হু করিতে থাকে, স্বরূপের আটচালার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই। গ্রামের ইতিহাস—পুরাতত্ত্ব স্বরূপের নখদর্পণে; একটা কিছু প্রসঙ্গ উঠিলেই আরম্ভ করিয়া দেয়। গান্ধীর যুগে ছেলে চরখার একটা অভ্যাস করিয়া দিয়াছিল, বোধ হয় বার্ধক্যের সঙ্গী হিসাবে স্বরূপ সেটাকে ধরিয়া আছে। চরখার ঘ্যানর-ঘ্যানরের সঙ্গে গল্প চলিতে থাকে।

একটা পাঞ্জাবী গেরুয়াধারী আসিয়া বোমার প্রতিষেধক হিসাবে বাড়ির চারিদিকে মন্ত্রপূত ধূলি ছড়াইয়া সবার কাছে বেশ পয়সা আদায় করিতেছে। সকালে কয়েকজন ছোকরা আসিয়া খবর দিল, তাহারা টের পাইয়াছে লোকটা নিজে রেঙ্গুন পলাতক। কিন্তু কর্তা আর গিন্নীদের আতঙ্কজনিত শ্রদ্ধার সামনে তাহাদের কোন কথাই টিকিতেছে না। স্বরূপের সঙ্গে সেই আলোচনাই হইতেছিল। মন্তব্যটুকু সেই প্রসঙ্গে।

স্বরূপের নাতির হাত থেকে হুঁকাটা লইয়া বলিলাম, "একটু ভেঙে বল স্বরূপ।"

স্বরূপ আরম্ভ করিল, "চৌধুরীরা—আপনাদের কেম্পানীর আমলের ভুঁইফোড় জমিদার নয় দা'ঠাকুর, ওরা হ'ল নবাবী আমলের পত্তনিদারের বংশ। সেই সাবেক যুগের ব্যাপার। নবাবে বাদশায় খাজনা নিয়ে খেঁচামেচি হ'লে চৌধুরীরা নবাবকে লেটেড়া জোগাত।....মূল পত্তন হয়েছিল লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কালে। লক্ষ্মীনারায়ণের তিন সংসারে দুই ছেলে—রামসুন্দর আর শ্যামসুন্দর। রামসুন্দর বিবাগী হয়ে যান, সংসার ধর্ম আর করেন না। শ্যামসুন্দরের চার সংসারে পাঁচটি সন্তান,—মহাদেব, কামদেব, হরদেব, শুকদেব আর বামনদেব। মহাদেব আর হরদেব অকালেই ফৌত হন। বাকি রইলেন কামদেব, শুকদেব আর বামনদেব। কামদেব বললেন, 'সাধ ছিল দাদা রাজ্য-পাট করবে, আমি তাঁর সেবা করব, আর গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব, আমার বয়ে গেছে এখন এ-সব হ্যাপা পোয়াতে।'.. বিবাগী হয়ে গেলেন। মহাদেব গেলেন, কামদেব, হরদেব গেলেন, বাকি রইলেন শুকদেব আর বামনদেব। দু'ভায়ে একেবারেই বনিবনাও হ'ল না। দলাদলির মধ্যে পড়ে অনেক প্রজা, বিস্তর লাঠিয়াল নষ্ট হ'ল, শেষে একদিন বাড়ীতেই চড়াও হয়ে বিস্তর হীরে-জহরৎ আর টাকাকড়ি হাতিয়ে ছোটভাই বামনদেব দেশত্যাগী হলেন। কেউ বলে ঢাকার ওদিকে গেলেন, কেউ বলে দিল্লীতে গিয়ে বাদশায়ের চাকুরি নেন। পরে নাকি মুসলমান হয়ে গিয়ে বাদশার মেয়েকেও বিয়ে করে বড় জায়গীরদার পদবী পান। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন দা'ঠাকুর। লোকে বলে চৌধুরী বংশে ঐ নাকি একটা দাগ আছে। জানিনে। ...ধরল কল্‌কেটা ?"

হুঁকাটা আগাইয়া দিতে মাথা থেকে কলিকাটা তুলিয়া লইয়া গোটা তিনচার টান দিল, তাহার পর ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "শুকদেবের সাত সংসারে তের সন্তান,—শক্তি-ভৈরব, আদ্যা-ভৈরব, উমা-ভৈরব...."

বলিলাম, "স্বরূপ মোটে তিনপুরুষ হ'ল। যে রকম কুলুজির দৌড় দেখছি, তাতে সবার হিসেব দিয়ে বড়কর্তায় পৌঁছুতে পহর ঘুরে যাবে! তার ওপর শুকদেবেরই যেখানে সাত সংসার, আর তের সন্তান, সেখানে ভৈরবের দল যে কি ব্যাপার দাঁড় করিয়েছিলেন কতকটা আন্দাজ করে নিতে পারি। তুমি কি যেন বড়কর্তার বিশ্বাসের কথা বলছিলে, সেই থেকেই আরম্ভ কর। এগুনো একদিন বসে ভাল করে শোনা যাবে তখন।"

স্বরূপ চরখা থামাইয়া আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল; বলিল, "আপনারা কোলকাতার লোক, বেশ রস দিয়ে কথা বলতে পারেন দা'ঠাকুর। তবে গোড়া বেঁধে না বললে বুঝবেন কেমন করে?..."

"চৌধুরীরা আগে ছেল ঘোর বোষ্টম, শুকদেব চৌধুরীর আমল থেকে ওঁরা শাক্ত হয়ে উঠলেন। শুকদেব চৌধুরী তান্ত্রিক গুরু ডেকে দীক্ষে নিলেন। সবাই মানা করলে—'কুলধর্ম্ম ছেড় না' শুকদেব বললেন—'কুলধর্ম্মই তো এতদিন ছিল না আমাদের। রাজা হবে কণ্ঠীধারী বোষ্টম। ষেদিন দেখব সিংগিতে চালকলা আর মালসাভোগ হাবড়াচ্ছে, সেইদিন আবার কণ্ঠী নোব'খন। ভয়ানক একবগ্‌গা লোক, কেউ আর বেশি ঘাঁটাঘাটি করলে না। শোনা কথা—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন দাদাঠাকুর—কুলগুরু নাকি পৈতে হাতে করে শাপমন্যি দেন। শুকদেব চৌধুরী শুনে বললেন—'বাঁচলাম, তবু রাগ বলে জিনিষটা একেবারে মিটে যায়নি ঠাকুরমশাইয়ের।' হুকুম করে দিলেন—কুলগুরুর যা কিছু বরাদ্দ ওঁদের বংশই পেয়ে আসবে। রাগটা শক্তিরই লক্ষণ হল কিনা দা'ঠাকুর, কথাটি বুঝলেন না?"

সেই থেকে একটানা চলে আসছে।

"আমাদের বড়কত্তা ছিলেন মহীন চৌধুরী। মহীন চৌধুরীর বাপ সনাতন চৌধুরীর সাত পরিবার দা'ঠাকুর, তা ভেন্ন..."

স্বরূপ গোড়ার দিক থেকে না পারিয়া আবার শেষের দিক থেকে আরম্ভ করিল নাকি? বাধা দিয়া বলিলাম, "মহীন চৌধুরী সনাতন চৌধুরীর তা'হলে কোন্ সন্তান ছিলেন স্বরূপ?"

স্বরূপ বলিল, "প্রথম বলুন, মধ্যম বলুন, আর শেষ বলুন—ঐ এক শিবরাত্তিরের সল্‌তে। ঐখানেই তো কাল হ'ল কি না দা'ঠাকুর। অত বড় সংসারের মধ্যে ঐ এক ছেলে, আদরে-আস্কারায় তার আর কিছু বাকি রইল না। বোষ্টমই হোক বা শাক্তই হোক দা'ঠাকুর, ও তোমার গিয়ে সংসারীই হোক বা বিবাগীই হোক, চৌধুরী বংশের সবার এক ধারা। তবে মহীন চৌধুরী আবার সবাইয়ের ওপর টেক্কা দিয়ে গেলেন। এ কথাটা এইখানেই তুলে থুই দা'ঠাকুর। নতুন বয়সে, টাকা-কাড়ির অভাব নেই, বাপমায়ের ঢালোয়া আদর.... আপনিই বলুন না কেন দা'ঠাকুর দোষ দেওয়া যায়?"

বলিলাম, "না, ওত হ'তেই হবে উপায় কি?"

স্বরূপ বলিল, "উপায় নেই। তবে শেষ বয়সে গিয়ে মহীন চৌধুরী সামলে উঠলেন—তবে একটা দোষ থেকেই গেল—নেশাটা। ঐটুকু সঙ্গে করে গঙ্গার ধারের মন্দির-বাড়িতে কায়েমী হলেন। দেখেছেন তো বাড়িটা?—একপাশে তারার মন্দির—শুকদেব চৌধুরীর পেতিষ্ঠে করা, মাঝখান দিয়ে গঙ্গার ঘাট, এদিক পানে দোতলা বাড়ি। তার ওপর তলায় গঙ্গার দিকের ঘরটায় মহীন চৌধুরী থাকতেন।

"একরকম সব ছেড়েছুড়েই দিয়েছিলেন এদানি৮ লোকও খুব কম থাকত। আমি ছিলাম খানসামা, গোটা দুই চাকর থাকত, আর একটা বামুন, ব্যস্। ইচ্ছে হ'ল কখন বাড়িতে একবার এলেন, নয়তো তাও নয়, হপ্তাকে হপ্তা মন্দির বাড়িতেই বোধ হয় কেটে গেল। নিতান্ত দরকার পড়ল নায়েবমশায় এসে কখনও এত্তালা দিলেন; বড়কত্তার সম্বিত রইল, ওপরে ডেকে একটু শুনলেন যেমন

ঝোঁকে আছেন, সেই মোতাবেক একটা হুকুম-টুকুম দিয়ে দিলেন। মাত্রা খুব বেশি হয়ে গেলে আমায় মন্দিরের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'কাগজপত্র ঐ বেটীর কাছে নিয়ে যেতে বলে দে দেওয়ানজীকে —আমি ও-বেটীর তো বাঁধা চাকর নই··'

"অমন ভক্তি লাখের মধ্যে একটা মানুষে দেখা যেত না দা'ঠাকুর। মা তেমনি আগলে ছিলও, অত বড় সম্পত্তি, অমন সংসার—একটা রাবণের গুষ্টি—বড়কর্ত্তা য্যাতদিন বেঁচে ছিলেন, সাম্নি কি কোথাও একটা লাগে।

"যেমন ভক্তি, তেমনি ছিল বিশ্বাস। কুলপুরুৎ, সদ্‌ব্রাহ্মণ, সাধু-ফকির, জ্যোতিষী—এরা যদি একটা কথা বললে তো বড়কর্ত্তা তাই আঁকড়ে ধরে রইলেন। এর দ্বারা অনেক ঠকতেও হয়েছে দা'ঠাকুর; কিন্তু হেন সাহস কারও ছিল না যে, সে কথা তুলে কেউ সতর্ক করতে যায়। কথা আর কিছুই নয় সতর্ক করা মানে হ'ল তুমি বোকা তোমায় সবাই ঠকিয়ে খাচ্ছে। তেমনি আবার ওদিকে তুমি যাদের সঙ্গে মিশছ, যাদের কথা শুনছ, যাদের বিশ্বাস কর তারা হল জোচ্চোর। বলতেন—এ দু'তরফা গালাগাল যে দেবে তাকে আমি আস্ত রাখব না, খবরদার!···"

আরও বলতেন, বলতেন, "জ্যোতিষী গণৎকারকে মিথ্যেবাদী বললে তাঁর ইষ্টদেবীকে অপমান করা হ'ল।"

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে স্বরূপ চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "এও ঠিক ঐ রকম করেই হল।—যবেকার যিটি হবার ঠিক করে দিয়ে মা-কালী বসে আছে, গণৎকার খড়ি কেটে কি হাত দেখে সিটি বলে দিলে। তার কথাটা না মানা কাকে না মানা হল বলুন না?"

আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেছি দেখিয়া স্বরূপ তার তামাটে গোঁফের মধ্য দিয়া হাসিয়া বলিল, 'দা'ঠাকুর, আপনারা সব লেখাপড়া

জানা মানুষ, আমরা হলুম মুখ্যু সুখ্যু; তবে অনেক দেখে শুনে মোটামুটি একটা ঠাওর করে রেখেছি,—মা-লক্ষ্মী কখনও এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন না। কিন্তু নড়বার উপায়ও চাই তো? তাই যাদের টাকা দিয়েছেন, সম্পত্তি দিয়েছেন তাদের দিয়েছেন বুদ্ধির অভাব, বা যদি দিলেন বুদ্ধি তো নেশায় চাপা দিয়ে দিলেন; যাদের সে সব কিছু দেন নি তাদের মাথায় রাজ্যির ফিচলেমি সাঁদ করিয়ে বসে আছেন, তা না হ'লে তাদের পুষ্যি সব যে না খেতে পেয়ে মারা যায় দা'ঠাকুর! বেশ পাকা ব্যবস্থা নয়?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, ব্যবস্থা বেশ পাকা বলতে হবে বইকি।"

স্বরূপ বলিল, "হতেই হবে যে দা'ঠাকুর। তুচ্ছটাকের সামান্য একটা জমিদারি চালাবার জন্যেই কি রকম আটঘাট বেঁধে চলতে হয় মানুষকে? আর এই গোটা বেহ্মাণ্ডটা তাঁর জমিদারি; মাথা খাটিয়েই চালাতে হচ্ছে তো?....দিন, দা'ঠাকুর পেসাদটা একটু।"

হুঁকাটা আগাইয়া দিতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া স্বরূপ খানিকক্ষণ টানিল, তাহার পর বলিতে লাগিল।

"সদ্ বাহ্মণদের মধ্যে সব চেয়ে ফিচেল ছিল রামধন পাঠক। লোকটার বাড়ি মেদিনীপুরের ওদিকে কোথায়। এখানে থাকত না, মাসে একবার দুবার করে কোথা থেকে ঘুরে ফিরে আসত। কখন বলত জ্বালামুখী থেকে এলাম, কখন পশুপতিনাথ থেকে, কখন কামিখ্যে থেকে। সঙ্গে কি সব পেসাদ, ঠাকুরের ফুল এই সব থাকত, আর পেরায়-ই একজন করে লোক সঙ্গে থাকত—নয় জ্যোতিষী, নয় পাণ্ডা, না হয় কোন বৈরিগী কাপালিক। বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে আনত দা'ঠাকুর, অথচ সব ওর দলের লোক, বেশির ভাগই ঘাটাল-মেদিনীপুরের—আমরা সব টের পেতাম কি না..."

প্রশ্ন করিলাম, "তা সাবধান করে দিতে না কেন?"

স্বরূপ বলিল, "তবে আর কি শুনলেন দা'ঠাকুর? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে মহীন চৌধুরীকে সাবধান করতে যাবে? আর আমি একা, ওদিকে ওরা সব,—মন্দিরের পুরুৎ দক্ষিণে চাটুজ্যে, কুলগুরু মাহেশের যোগীন বেহ্মচারী, চরণ অঘোরী, রামধন —এদের মধ্যে আমার একার কথা চলবে কেন দা'ঠাকুর? দু'এক-বার চেষ্টাচ'রিত্ত করলুম তারপর ধমক ধামক খেয়ে চুপ করে গেলুম।

"রামধন যখন আসত, মন্দির-বাড়িতে যাগ-যগ্যি পুজো-বলির ধূম পড়ে যেত, আর অষ্টপহর কারণ আর কারণ। দিন তিন চার এই রকম থাকত, তারপর বেশ ভাল করে কিছু হাতিয়ে রামধন আর তার সঙ্গী ডুব মারত। সে গেলেই দলটা ভেঙ্গে যেত, বড়কর্ত্তা নিজে একলা একলা কারণের জের টেনে যেতেন।

• "এই করে তো কাটতে থাকুক, এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে বসল দা'ঠাকুর। কর্ত্তাদের আমলে বড়কর্ত্তা যখন কলকাতায় থেকে পড়তেন, তখন তাঁর বিস্তর ইয়ার বন্ধু জুটেছিল, তাদের মধ্যে প্রায় কেউ না কেউ আসত মন্দির-বাড়িতে। সেদিন তাঁর সব চেয়ে পেয়ারের বন্ধু অমর্ত্ত মল্লিক এসেছে। দুপুরবেলা থেকেই সেদিন কারণের বাড়াবাড়ি চলেছে, তার ওপর হবি তো হ, সন্দের গাড়িতে একেবারে সশরীরে রামধন পাঠক। রামধন এবারে প্রায় মাস আড়ায়েক পরে এল, সঙ্গে একটা মানুষ, কতকটা বুনো কতকটা সন্নিসী। কোমরে একটা মোটা কাছির সঙ্গে কোপ্‌নি বাঁধা। কাঁধ পর্যন্ত তাঁবাটে ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, শুধু বাঁ দিক দিয়ে তিনটে জটা কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে তাতে একটা বেগুনে রঙের ধুতরো ফুল। রামধন বললে তার দেরি হল, সে কেদার-বদরি হয়ে কৈলেসধামে গিয়েছিল সুবার সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে। অনেক গল্প করলে—মহাদেব কেমন আছেন,

পার্ব্বতী কি বললেন, কার্ত্তিক, গণেশ আজকাল কেমনটি হয়েছে—কুবেরের কথা, নন্দী, ভিরিঙ্গীর কথা—একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে গেল সঙ্গের লোকটারও পরচে দিলে, বললে এ হচ্ছে নন্দী ভিরিঙ্গীদের দৌহিত্তির সন্তান—সাতান্ন পুরুষে। আলাপ হল, তাই রামধম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। থাকবে না, একবার কলকাতা সহরটা দেখেই চলে যাবে।

"একে অমর্ত্ত মাল্লিক এসেছে তার ওপর পাঠক, আবার তার সঙ্গে ভিরিঙ্গীর দৌহিত্তির সন্তান—কারণের মহাবজ্জা পড়ে গেল দা'ঠাকুর। আমি বুঝেছিলাম পাঠক কোন বুনোকে নেংটি পরিয়ে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে—মোটা রকম আদায় করবে, কিন্তু ঐ অত কারণের ওপর তার গাঁজা খাবার ঘটা দেখে আমারও ধোঁকা লেগে গেল দা'ঠাকুর—হয় না হয়—সত্যিই বোধ হয় নন্দী ভিরিঙ্গীদেরই কেউ হবে। সব সরঞ্জাম নিজের,—একটি বটুয়ার মধ্যে পেতল দিয়ে বাঁধান আধ হাতের একটি কলকে, গুটি পাঁচ ছয় বেশ পুরুষ্টু পুরুষ্টু গাঁজার জটা, একটি ধোঁয়ায় তামাটে মারা ভিজে ন্যাকড়া, দেশলাইয়ের পাট নেই, চমকি—দেখলেই বোঝা যায় বনেদী গাঁজাখোরের ঘরের জিনিস। সেজে টেজে নিজে দু'টো টান দিয়ে কেতা মাফিক সবার সামনে একবার করে বাড়িয়ে ধরলে। কেউ আর নিতে সাহস করলে না। শুধু পাঠক একবার একটা টান দিয়ে ভিমি গেল, দু'বোতল অডি কলোন মাথায় চাপড়াতে জ্ঞান হল।—ভাণ করলে কি সত্যি তা বাবা তার কথাই জানেন দা'ঠাকুর, যা দেখেছিলুম হুবহু বললুম।

"রাত প্রায় বারোটা হবে, কৈলেসধামের গল্প চলছে, কারণের ঝোঁকে বুকে ঘাড় গুজড়ে সবাই আস্তে আস্তে মাথা, নাড়ছে, হঠাৎ বড়কত্তা মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'পাঠক মশাই, এমন বনেদী ঘরের ছেলে পাওয়া গেছে, হাতটা একবার দেখিয়ে নিলে হত না?—ক'টা এখন আছে, ক'টা টে'কবে, ক'টা যাবে।'…ছেলেপিলের হিসেব কখন রাখতে

পারতেন না কিনা, ঐ মাঝে মাঝে হাত গুণিয়ে নিতেন। আমি ছিলুম খানসামা, সর্ব্বদাই হাজির থাকতে হ'ত দা'ঠাকুর, দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে সবই দেখতাম। দেখলাম পাঠকে আর ভিরিঙ্গীর দৌহিত্তিরে একটা চোখাচোখি হয়ে গেল। পাঠক দুটো হাতের আঙুল নেড়ে কি ইসারা করলে আর সে ঘাড় নাড়লে। পাঠক বড়কর্ত্তাকে বললে, 'খুব, খুব। তিনটে কাল তো ওঁদের নখদর্পণে।....দেখুন তো বাবা কর্ত্তার হাতটা একবার।'...হিন্দিতেই কি করে বললেন দা'ঠাকুর আমার আবার ঠিক আসে না। কর্ত্তা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

"দৌহিত্তির সন্তান উলটে পালটে হাতটা দেখতে লাগলো, আর পাঠকের হাতের দিকে আড়ে চাইতে লাগলো। একবার বললে,

"ল্যাড়কা তো বহুৎ হায়।"

সবাই তো এক দলের দা'ঠাকুর!—যেন কতই পরীক্ষে হচ্ছে সেই রকম ভাব দেখিয়ে যোগীন বেম্মচারী একটু মুচকি হেসে বললে, 'বহুৎ হ্যায় বল্লেই তো শুনব না বাবাঠাকুর, কেৎনা হ্যায় বলতে পার তবে তো...'বলে একটু চোখ টিপে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই হাই তোলবার ভাণ করে মাথার ওপর হাত নিয়ে গিয়ে দু'হাতের দশটা আঙুল উঁচিয়ে ধরলে। বাবাজি হিন্দিতে বললে, "দশটা তো হ্যায়।'

"ঐ যে বললুম—ছেলেপিলের হিসেব কখন রাখতে পারতেন না বড়কর্ত্তা, বললেন—'ঠিক হ'ল তো পুরুৎ মশাই, দেখুনতো মিলিয়ে।' দক্ষিণে চাটুজ্যে বললেন, "যেটের কোলে ঐ কটিই তো আছে।' বড়কর্ত্তা হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেলেন, কিন্তু সেদিন সেই কোন্ দুপুরবেলা থেকে চলছিল কিনা—টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়লেন। পাঠক তুলতে গেলে বললেন—'একটু পায়ে গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছি, তুলবেন না।'

"ছেলের কথা ফলে গেল দেখে বাবাজি নিজে হ'তেই মেয়ের

কথা পাড়তে গেল। পাঠক, বেহ্মচারী, দুজনেই তাড়াতাড়ি হাই তোলবার ভাণ করে মাথার ওপর বুড়ো আঙুলটা উঁচিয়ে চোখ টিপিল।



একটু পায়ে গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছি, তুলবেন না

"এইখানেই গোলমাল বাধল দা'ঠাকুর। মা-কালী যেমন সব জেতের এক ভাষা দেন নি, তেমনি এক রকম ইসেরাও যে দেন নি

একথাটা ওরা অতটা ভেবে দেখে নি। করতে গেল এক হয়ে উঠল আর। মাথার ওপর একটা আঙুল খাড়া করা দেখে বাবাজী আর ধরতে পারলে না যে, ওদিকে অষ্টরম্ভা,—বলে উঠল, 'লড়কী একঠো হ্যায়।'

"দোরের পাশটিতে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হ'ল আহ্লাদে ডিগবাজি খেয়ে দিই, দা'ঠাকুর—এবার বেটা গাঁজাখোরের বুজরুকি ধরা পড়েছে। চরণ, পাঠক, বৈরিগী, পুরুৎ—চাটুজ্যে তো একেবারে থ' মেরে গেছে, বেহ্মচারী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কি একটা বলতে যাবে, বড়কত্তা টলতে টলতে উঠে বসলেন বড় বড় টানা চোখ একেবারে রক্তজবা, ভিরিঙ্গীর দৌহিত্তের মুখের দিকে চেয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে বসলেন—যেন বাঘে থাবা গেড়ে বসেছে দা'ঠাকুর। দৌহিত্তির বেটা ত্যাতক্ষণে টের পেয়েছে যে, বে-ফাঁস হ'য়ে গেছে, টেনে ছুট দিত বোধ হয়; একবার পেছনে ফিরে দেখে আমি বারান্দায় আধা-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

"বড়কত্তা তেমনিভাবে টলতে টলতে জিগ্যেস করলেন, 'বয়স কত হ'ল?'

"মিথ্যে কথাটা পাকা করিয়ে নিচ্ছে, দেখে সবার নেশা ছুটে গেছে। এদিকে বড়কত্তা ঘাড় তুলে বসে,—কেউ যে ইসেরাও করবে তার উপায় নেই, সব কাট মেরে বসে রইল দা'ঠাকুর। দৌহিত্তিরের তখন দফা নিকেশ, বোধ হয় বেশি বয়েস বললে আবার জামাই, নাতি-নাতনীর হিসেব দিতে হবে—এই ভয়ে আমতা আমতা করে বলে ফেললে—'ত্যারো বছর কা।'

"বড়কত্তা গর্জন করে উঠলেন, 'মণ্ডল, দাওয়ানজী কো বোলাও।'

"খুব চটে গেলে হিন্দি কথাই বলতেন, দা'ঠাকুর।

"আমি চাকর দু'টোকে পাহারায় মোতায়েন করে তিন লাফে সিঁড়ি উৎরে ছুটলাম দা'ঠাকুর; অত ফুর্তি অনেকদিন হয় নি। দাওয়ানজীকে তো ডেকে আনলাম, সঙ্গে হারু পেয়াদা, রাঘব বাগ্দীর বেটা যতে, আর চৌবেজী।

"এসে দেখি সব ঠায় একভাবে বসে, শুধু বড়কত্তার ঘাড়টা একটু ঢুলে পড়েছে। এদিকে রঘু চাকরটা নেমে মালীকে ডেকে এনেছিল, তারা একটু তফাতে থেকে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি গিয়ে বললুম, 'দাওয়ানজী এলেন হুজুর।'

"বড়কত্তা ঘাড় তুললেন। দৌহিত্তিরের দিকে চেয়ে আঙুলটা বাড়িয়ে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কত বললেন—পনেরো?'

"দৌহিত্তিরের তখন আর ধড়ে প্রাণ নেই, বললে, 'জী হ্যাঁ।'

"আমাদের তখন মনে হচ্ছে—এইবার পড়ি ঘাড়ে লাফিয়ে।

"বড়কত্তা দাওয়ানজীর দিকে চেয়ে চক্ষু আরও রাঙা করে ঠায় খানিকক্ষণ একদিষ্টে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন—'আর তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও।....পাঁজি কৈ?...দুলাল, দা'ঠাকুরকে আর তামাক দিবিনে বুঝি?'

স্বরূপ চুপ করিতে প্রশ্ন করিলাম, "মগজে বুঝি ভূজীর দৌহিত্রের কথাটা গ্যাঁট হয়ে বসে গেল?"

স্বরূপ সুতার একটা পাক খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল, "বসে গেল বলে বসে গেল দা'ঠাকুর? তক্ষুণি পাঁজি এল, দিন স্থির হল, ফর্দ তোয়ের হ'ল। চার দিনের মধ্যে বিয়ে, সবার ঘুম গেল ছুটে, সেই মুহূর্ত্ত থেকে হুলস্থূল করে সবাই তোড়জোড়ে লেগে গেল। রোশোন চৌকির জন্যে কাশীতে লোক ছুটল, গড়ের বাদ্যির জন্যে কলকাতায়; মহালে মহালে পাইক-বরকন্দাজের সাড়া পড়ে গেল। আর চারখানা গেরামের যত ঘটক সব চারিদিকে চারিয়ে পড়ল—বরের তল্লাসে। নিন্ দা'ঠাকুর, তামাক এসেছেন।"

হুঁকায় কলিকা বসাইয়া বলিলাম, "এক সময় এই সব কাণ্ড হত স্বরূপ, শুনেছি বেড়ালের বিয়েতেও জমিদারি বিকিয়ে যেত। অতটা ব্যাপার হ'ল কেউ একবার সাহস করে মনে করিয়ে দিলে না যে, মেয়ে নেই?..."

স্বরূপ তামাটে গোঁফের ভিতর একটু হাসিল, বলিল, "কোথায় সমুদ্দুরের ওদিকে বোমা পড়েছে, তাইতেই কলকাতা ছেড়ে গেরামে পালিয়ে এসেছেন দা'ঠাকুর।

"মহীন চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে, সাতখানা গ্রামে নেমন্তন্ন পড়েছে, মান ইজ্জতের ব্যাপার। কার ঘাড়ে পাঁচটা মাথা আছে দা'ঠাকুর যে, বলতে যাবে—এত কাণ্ডের মধ্যে কনেরই বালাই নেই? নয় মরিয়া হয়ে বললে, কিন্তু বলবে কাকে?—চৌধুরী বংশে চেরকালটা গৌরীদান হয়ে এসেছে। পনের বছরের মেয়ে—সমাজে আর মুখ দেখাবেন না বলে সেই যে মন্দির বাড়িতে খিল দিতে বললেন—সাত দিন আর খোলা হয় নি, শুধু কারণ, আর কারণ। বললেন—'মুখ দেখাবও না কাউকে, দেখবও না কারুর মুখ—সবাই আমায় পতিত করলে।…' সেই এক বিশ্বেস দেখিয়ে গেছেন দা'ঠাকুর, তাই বলছিলাম…."

বলিলাম, "তা নয় হ'ল; কিন্তু যারা বর নিয়ে এল…."

স্বরূপ চরকা থামাইয়া বলিল, "জনাই থেকে বরযাত্রী এসেছিল দা'ঠাকুর, একৃসে এক মাতাল সব—তাদের সামনে আমাদের মন্নুরীর মাতালেরা তো শিশু। বর পশ্চিমে পেরয়াগের ওদিকে কোথায় যেন কাজ করে, এখানে এসে বরপক্ষের সবাই টের পেলে তাকে খবর দেওয়া হয়নি, বড্ড তাড়া হুড়োর মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল কিনা….

"আসল কথা তা নয়, দা'ঠাকুর, মা-কালীর তো চারিদিকেই নজর রাখতে হয়, ঐ করে সামলে নিলেন আর কি।..এদিকেও কনের আসন খালি, কেউ আর ও সামান্য কথাটুকু নিয়ে উচ্চবাচ্য করলে না, বেশ সুচ্ রুস্কুলেই শুভকাজটা হয়ে গেল…"

"সেই এক বিশ্বেস দেখেছি দা'ঠাকুর, তেমনটি আর দেখব না।—তেমন ঘটাও কি কখন দেখব দা'ঠাকুর?…দেখি, পেসাদটা পাই একবার, ধরল?"

বাঁটুলের রবীন্দ্রনাথ

[১]

অখিল প্রথম ব্যাচে বসিয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে, ঢেকুর তুলিতে তুলিতে আসিয়া ফরাশের উপর চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বাঁটুলের পানে চাহিয়া বলিল, "বৈটল যে, তোর পেট কি বলে আজ?"

বাঁটুল রগ দুইটা আলগাভাবে টিপিয়া বসিয়া ছিল। পেট-রোগা মানুষ, সেই অনুপাতে খাওয়ার শখটাও একটু বেশি। বলিল, "পেটের আর আমার কি হয়েছে? তোদের যেমন সব—। কপালটা একটু যেন টিপটিপ করছে, সামান্য।....রান্নাবান্না কেমন হয়েছে রে অখিল?"

অখিল শুইয়া শুইয়াই ঘাড়টা উল্টাইয়া বলিল, "তুই দ্বিতীয় বারেও বসলি না? মরবি দেখছি, ফাঁকি পড়বি।"

বাঁটুল কপাল হইতে হাত নামাইয়া একটু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন বল্ দিকিন?"

"এরা কলকাতা থেকে যে রসগোল্লা আনিয়েছিল, বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে, হাত টেনে দিচ্ছিল।...তুই সেকেণ্ড ব্যাচটা বাদ দিলি কেন?"

বাঁটুল আরও উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "ফুরিয়ে এসেছে? তা হ'লে—"

অনুকুল কবিরাজের ভাগিনেয় রাখাল বাঁটুলের উপর দিয়া চিকিৎসায় হাত পাকাইতেছে; বলিল, সেকেণ্ড ব্যাচে বসে নি, তার কারণ ওকে একটা বৃকোদর-বটিকা দিয়েছি ঘণ্টাখানেক হ'ল; সেটার কাজ আরম্ভ হোক একটু—"

বাঁটুল চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, পেটটাতে দুইটা মৃদু আঘাত দিয়া বলিল, "আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে; দেখব তা হ'লে, সেকেণ্ড ব্যাচে আর জায়গা আছে কি না?"

অখিল বলিল. "তিলমাত্র নেই। রসগোল্লা ফুরিয়ে এসেছে বলে কানাঘুষো হতেই একটা আতঙ্ক হয়ে গেল; আসন সব ভরে যেতে লোকেরা নিজেরাই কোথা থেকে আসন, গেলাস পাতা খুরি যোগাড় করে নিয়ে, কোণে-কানে যেখানে একটু জায়গা ছিল সব ভরাট করে ফেললে। মোটাজগন্নাথ বেচারাকে এমন দেয়াল চেপে বসতে হয়েচে, খানকয়েক লুচি পেটে পড়লে যখন আড়ে বাড়বে, তখন কি যে হবে!"

বাঁটুল উঠিয়া পড়িল।

প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় চললি? শুনছিস জায়গা নেই।"

বাঁটুল বিরক্তভাবে ঘুরিয়া বলিল, "আচ্ছা, কি লাভ হ'ল তোর পেছু ডেকে? একবার ভাঁড়াড়ের দিকে যাব ভাবলাম, রসময় কাকা ইন্‌চার্জ আছে, একবার চেহারাটা দেখিয়ে আসি। দিলে ডেকে পেছনে! একে তো বাড়ি থেকে বেরুতেই খেঁদা টুকে দিয়েছে, পদে পদে দুঃসংবাদই শুনে যাচ্ছি এখন পর্য্যন্ত!"

[২]

প্রায় মিনিট পনরো পরে বাঁটুল ফিরিল। ডান হাতে কাগজের একটা পুটুঁলির মত, নীচের দিকটা ভিজিয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "রসময়কাকা বললেন, ততটা ভয় নেই, 'তবে সব ছেড়ে লোকে যেমন রসগোল্লার দিকে ঝুঁকেছিল, ব্রেক্ না কষলে এতক্ষণ সব লোপাট করে দিত। তবুও বললাম, 'কাকা, বেঁটলোর অদেষ্ট, বিধাতাপুরুষ আঁতুড়ে-ষষ্ঠীর দিন কপালে টিকে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছিল। তুমি গোটাকতক নমুনা ছাড়, সরিয়ে রাখি।' টিনের ভেতর হাত ডুবিয়ে এক মুঠো দিলে বের করে, ভরা মুঠো, মিথ্যে বলব না। গোটা দশেক উঠেছিল, ছটা রয়েছে

এখন—মানে, তবু ধুকপুকুনিটা খানিকটা গেল। একবার ঘুরে এলাম কিনা ও দিক দিয়েও এ ব্যাচে আবার বেছে বেছে যেমন সব বসেছে—"

রাখাল বিমূঢ় এবং ক্রুদ্ধ ভাবে বসিয়া ছিল, বলিল, "রাখালের কথা ছেড়ে দে, স্বয়ং ধন্বন্তরি এলেও তোকে বাঁচাতে পারবে না; ওষুধটা না ধরতে ধরতে তুই অতগুলো রসগোল্লা কি বলে গিলে বসে থাকলি বল্ তো? নে, এই বড়ির অদ্ধেকটা মুখে ফেলে দে। নিজে তো মরবিই, আমারও বদনাম করবি তুই।"

হরিশ আসিল। তাহারও আহার হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "ওটা কিরে অখিল?"

অখিল বলিল, "বাঁটুলের রসগোল্লা।"

হরিশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "রসগোল্লা। ছাঁদা বেঁধেছে নাকি? আমার তো দুটোর বেশি আদায় করতেই জিব বেরিয়ে গেছল।"

অখিল বলিল, "তোর যদি ইচ্ছে থাকে তো খা না গোটাকতক আরও। দে না বাটুল, সামান্যর জন্যে মনে একটা সাধ অপূর্ণ রাখাটা কাজের কথা নয়। হরিশ যতই নিরোগ হোক না কেন, মানুষের আয়ু পদ্মপত্রে জল—"

হরিশ শাসাইয়া বলিল, "খবরদার, নিরোগ-নিরোগ করে খুঁড়বি নি অখিল, একে খাওয়াটা একটু চাপ হয়ে গেছে।"

কাগজের বাণ্ডিলটার উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কটা আছে রে বাঁটুল? করেছে ভাল, এখনও মুখে তারটা লেগে রয়েছে—"

বাঁটুল উঠিল। ছয়টা রসগোল্লাই একসঙ্গে মুখে গুঁজিয়া দিয়া কাগজটা ফেলিয়া দিল, তাহার পর রসগোল্লা-গাদা মুখে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া নিজের হাতের বুড়া-আঙুল দুইটা একবার নাড়িয়া দিল।

হরিশ বলিল, "বাব্বাঃ, মরবে কি বাঁচবে জ্ঞান নেই; তবু যদি ট্যাঁকে কবিরাজ গুঁজে না বেড়াত!"

রাখাল মুখটা গোঁজ করিয়া উঠিয়া পড়িল ; দুয়ার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া বলিল, "আমি জবাব দিলাম বৈটল, আমার বাবার সাধ্যি নেই।"



বাঁটুল রসগোল্লা-গাদা মুখে...বুড়া আঙুল দু'টা নাড়িল

অখিল পরিত্যক্ত কাগজটার পানে চাহিয়া ছিল, বাঁটুলের পানে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল, "তুই এ কাগজটা কোথায় পেলি রে বৈটল?"

বাঁটুল কাগজটার পানে আড়চোখে চাহিয়া লইয়া বলিল, "একটা ক্যাটলগ না কি থেকে ছিঁড়ে নিলাম।"

আগাইয়া আসিয়া কাগজটা তুলিয়া অখিল বলিল, "তুই একেবারে আজ চরম করলি বেঁটল! এই তোর ক্যাটলগের পাতা? রসগোল্লার নামে একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলি?"

দেখি, 'রবিবার' নামক রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত গল্পের প্রথম তিনটা পাতা।

অখিল রাগতভাবে প্রশ্ন করিল, "একবার আন্ তো তোর ক্যাটলগটা।...উঃ তুই খুন করতে পারিস!"

বাঁটুল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বেশ গতরওলা আর রংচঙে দেখলাম বাইরেটা, তাই ভাবলাম বুঝি একটা ক্যাটলগ্ হবে, দুটো পাতা ছিঁড়ে নিলাম।"

অখিল বলিল, "আচ্ছা, বেশ করেছিস, তোর উপযুক্ত কাজই হয়েছে, এখন ক্যাটলগটা নিয়ে আয় একবার দেখি।"

আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বহুদিন পরে রবিবাবুর একটা গল্প বেরিয়েছে, পড়েছিস তুই শৈলেন?"

বলিলাম, "না, এখনও যোগাড় করে উঠতে পারি নি, বড্ড কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে কাগজটা নিয়ে।—যা না বাঁটুল।"

বাঁটুল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "যা না বাপু, গরজ থাকে তো। আমার মধ্যে অত কাব্যি নেই. তায় ক্ষিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছে, তার ওপর আজ আবার পূর্ণিমে, রগ দুটো টিপটিপ করছে।"

দুইটা আঙুলের ডগা দিয়া রগ টিপিয়া বসিয়া রহিল।

দুই এক জন করিয়া ততক্ষণে আরও সবাই জুটিয়াছে; বেশির ভাগই অভুক্ত। সুধেন, বিমল, আলোক প্রভৃতি রবিবাবুর কয়েকজন গোঁড়া ভক্তও আছে তাহাদের মধ্যে। বাঁটুলের লাঞ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের চাহিদা

বাড়িয়া গেল। কাগজ লইয়া আসিতে বাঁটুলকে কোনমতেই রাজি করা গেল না, অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, "সন্ধান দিচ্ছি, নিয়ে আয় গরজ থাকে তো, ভাড়ার-ঘরে টেবিলের ওপর যেখানে পানের গাদা আছে সেখানে পড়ে আছে। যে যাবে সে যেন রসময় কাকার কাছ থেকে আরও গোটাকতক নিয়ে আসে, রেখেছিলাম অনেক করে বাঁচিয়ে, কিন্তু যা সব রেয়োভাটদের পাল্লায় পড়া গেল!"

"দেখি, এদিকে কত দূর।"—বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, কয়েকজন মিলিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল। বিমল বলিল, "না, তোর সাজা হওয়া উচিত, তুই রবিবাবুর গল্প ছিঁড়ে নিয়ে রসগোল্লার ছাঁদা বেঁধেছিস। তোর অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত নেই, তবুও কিছু একটা সাজা তোকে নিতেই হবে। ওদিকে সবাই নেমন্তন্ন খাক, তুই বসে বসে এখানে রবিবাবুর লেখা শোন; তোর পক্ষে এই সবচেয়ে বড় সাজা।"

তুমুল কলরবের সঙ্গে সকলে কথাটা সমর্থন করিল। একজন গিয়া ভাড়ার-ঘর হইতে কাগজটা সংগ্রহ করিয়া আনিল। অখিল তাহার হাতের রস-মাখানো পাতা তিনটা একটু আলগা হাতে মুছিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

বাঁটুল ছাড়া পাইবার অনেক চেষ্টা করিল, মাথা টিপটিপ করার অজুহাত হইতে রাগারাগি পর্যন্ত, কিন্তু কোনমতেই সফল না হইয়া নোঙর-ফেলা নৌকার মত হাত পা আবদ্ধ হইয়া নিরুপায়ভাবে স্থির হইয়া রহিল।

[৩]

গল্পটি একটু দুষ্পাচ্য—ভাব, ভাষা দুই দিক দিয়াই। নেহাৎ বিমল, আলোক, অখিল ছাড়া সবার উৎসাহই একটু এলাইয়া আসিয়াছে। যখন প্রায় পাতা দুয়েকের কাছাকাছি শেষ হইয়াছে, ওদিকে ঢেকুরের শব্দে

ও জুতা-খোঁজার আর্ত চেঁচামেচিতে বোঝা গেল সেকেণ্ড ব্যাচ উঠিয়াছে। শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভুক্ত, অখিলের উপর তাগাদা হইল, একটু তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লইতে; থার্ড ব্যাচটা যেন না হাতছাড়া হয়।

একজন বলিল, "না হয় ঐ পর্যন্ত থাক না; এসে আবার শোনা যাবে।"

উত্তর দিল বাঁটুল, চারিটা আঙুলের ডগা দিয়া পেটে ধীরে ধীরে আঘাত করিতেছিল, বলিল, "পরিষ্কার করে আসন পাততে, পাতা গেলাস খুরি সব দিতে একটু দেরি হবে, ততক্ষণে সেরে নিক না।"

ভুক্ত, অভুক্ত সকলেই একবার বিস্মিতভাবে বাঁটুলের পানে চাহিল। যাহারা নোঙর হইয়া উহার হাত চাপিয়া বসিয়া ছিল, একটু আলগা দিল। গল্প শোনায় যাহাদের উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা আবার অন্তত লোকদেখানি মনোযোগী হইয়া উঠিল, বাঁটুলের উপরে থাকিতে হইবে তো!

প্রায় মিনিট-কুড়িক হইয়াছে, গল্পের প্রায় মাঝামাঝি, এমন সময় ডাক পড়িল। আমাদের ঘর হইতেই একজন গলা পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া কিছুক্ষণ আগে উঠিয়া গিয়াছিল, সেই আসিয়া খবরটা দিল। ওদিকে পাতের দিকে বুভুক্ষুদের যে একটি স্রোত নামিয়াছে, একটা অসংলগ্ন কলরবে তাহারও পরিচয় পাওয়া গেল।

বাঁটুলের মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। মুহূর্ত-খানেকের জন্য তাহার মনে যেন একটি ঝড় বহিয়া গেল, তাহার পর কতকটা যেন ব্যাকুলভাবে বলিল, "আমরা আসছি—কতটা আর আছেরে অখিল?"

যে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহাকে বলিল, "আমাদের কজনের জন্যে একপাশে গোটাকতক আসন রিজার্ভ রাখবেন।"

সবাইয়ের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, "এই খান

আষ্টেক আসন, বেশি নয়।···নে অখিল, শেষ করে ফেল্। আগেই মানা করেছিলাম, করিস নি আরম্ভ।"

একটা কথা আছে, ভূতের মুখে রামনাম। যদি তাহাও শুনিতাম তো ততটা বিস্মিত হইতাম না। বাঁটুল সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। বিমলকে লইয়া তিন চার জন প্রায় অর্ধেক উঠিয়া পড়িয়াছিল, কবিবরের প্রতি ভক্তি এবং নিষ্ঠার অভাবে একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার খুব সন্তর্পণে বসিয়া পড়িল। কেহ আর কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। আমার মুখে একটা হাসি ঠেলিয়া আসিতেছিল, গোপন করিবার জন্য মুখটা ফিরাইয়া লইলাম। সাবাস বাঁটুল! লোক দেখানো ভক্তবৃন্দকে খুব জব্দ করিয়াছে; এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি বাঁটুলের ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত পেটেও ছিল!

যে ডাকিতে আসিয়াছিল, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বাবুদের নভেল পড়া হচ্ছে বলে আসন রিজার্ভ রাখতে হবে! থাকবে'খন রিজার্ভ ভাল করে।"—বলিয়া কালক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল।

অখিল আবার পড়িতে লাগিল।

ওদিকে গোলমালের বহরে বোঝা যাইতেছে, রিজার্ভ তো দূরের কথা পাতা লইয়া যেন কড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে—'ওদিকে হে, ওঁদের ওদিকে পাঠিয়ে দাও;' 'বারান্দার ওদিকটাও দেখ দিকিন;' 'না, এদিকে আর পাঠিও না কাউকে; আসনের চেয়ে ক্যাণ্ডিডেট বেশি—'

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিল, "ঐ পর্যন্ত থাক না অখিলদা, খেয়ে এসে আবার শোনা যাবে'খন, চমৎকার লাগছে—"

পাছে বাঁটুল উঁচুদরের কিছু একটা বলিয়া বসে, সেই ভয়ে বিমল তাড়াতাড়ি বলিল, "তাতে একটু রসভঙ্গ হয়, তবে কথা হচ্ছে—"

অখিল বলিল, "তোমাদের যার শোনবার সে শোন, আর যার খাবার সে যাও, আমার তো আর খাওয়ার হাঙ্গাম নেই, যখন ধরেছি শেষ করে ফেলি।"

দেখিতেছি বাঁটুল একটা অসহ্য-রকম দোটানার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। অধৈর্যভাবে বলিয়া উঠিল, "বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি—"

এমন সময় একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "তোমাদের সব হয়ে গেছে নিশ্চয়, না আছ কেউ বাকি? গোটাকতক আসন আছে খালি এখনও বারান্দার একেবারে ওদিকে।"

কয়েকজন আর এ সুযোগটা হারাইল না। "আছে নাকি খালি? দেখি তো।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, একেবারে বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষুলজ্জার ভয়ে কাহারও দিকে চাহিল না। বাকি রহিলাম আমি, বিমল, আলোক, সুধেন আর বাঁটুল। পড়া আবার আরম্ভ হইল। আলোক আর সুধেন বাঁটুলের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, এরই মধ্যে কখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমন ওষুধ-গেলা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনিতে এর পূর্বে কখনও দেখি নাই। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিতেছি। প্রথমে যে ভাবিয়াছিলাম, বাঁটুল সবাইকে জব্দ করিবার জন্য কপট ভক্ত সাজিয়াছে, সে ধারণা টিঁকিতেছে না। অবশ্য বাঁটুলের মুখে রসগ্রাহিতার কোন ভাব দেখিতেছি না, ও যে কিছুই, অন্তত অনেক কিছুই, বুঝিতেছে না এটা ঠিক, কিন্তু চক্ষে ওর দারুণ উদ্বেগ। আসন সব দখল হইয়া গেল সেজন্য? কিন্তু তাহা হইলে বসিয়া আছে কেন? কে উহাকে মাথার দিব্য দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে? ওর মুখে কোন রকম আক্রোশের ভাবও তো নাই। তবে কি বাঁটুল সত্যই রবীন্দ্রভক্ত হইয়া উঠিল? আশ্চর্য কি? কবিবর হঠাৎ বোধ হয় কোন্ তন্ত্রীতে ঘা দিয়াছেন! কবিবরের ভক্তের শুনিয়াছি অনেক রকমারি আছে, এও এক রকমের নাকি?

আলোক, বিমল, সুধেন এক এক বার জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে আড়চোখে বাঁটুলের পানে চাহিয়া চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছে। ওদিক হইতে

শব্দ আসিতেছে—'এখানে বেগুনভাজা পড়ে নি,' 'কুমড়োর তরকারিটা নিয়ে এস,' 'লুচি'। 'এত কমে হবে না, ঝুড়িটা ভর্তি করে নিয়ে এস।' 'এ কখানা পাত খালি রইল কেন? তা হ'লে উঠিয়ে নাও।'

সুধেন বলিল, "এক মিনিট অখিলদা, বলে আসি, পাত তোলবার দরকার নেই—হাফ-এ-মিনিট।"

অবশ্য ফিরিল না।

প্রায় মিনিট দুয়েকের কাছাকাছি যখন হইয়াছে, বাঁটুল বিরক্ত হইয়া বলিল, "হাফ-মিনিট। যত্তো! পড় না অখিল, ও আর এসেছে, মিছিমিছি একটা ভাঁওতা দিয়ে—"

বিমল রাগটা ঝাড়িবার একটা সুবিধা পাইয়া একেবারে নাকমুখ খিঁচাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, "মিছিমিছি ভাঁওতা মানে? আর তুই যে এই কিছু বুঝছিস না, সুঝছিস না, মহাভক্ত সেজে বসে আছিস, এটা বুঝি খুব সত্যি? রাখ, বটতলার একটা নভেল বুঝতে ভির্মি লেগে যায়, উনি একেবারে রবীন্দ্রনাথের মহা-সমঝদার হয়ে দাঁড়ালেন। আচ্ছা, দাঁড়া ঐখানেই মানে বল দিকিন, বের কর তো অখিল, সেখানটা—"

একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "সুধেনদাকে ওরা আটকে রাখলে। জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছে, তিনটে সীট এখনও ধরে রেখেছে, আপনারা যাবেন নাকি?"

বিমল বলিল, "আটকে রাখলেই হ'ল? জবরদস্তি নাকি? চল তো দেখি। অখিল, একটু থেমে যা ভাই, ছ্যাও না পড়ে যায়।"

"তুই একলা টেনে আনতে পারবি না; এক সেকেণ্ড অখিল।—" বলিয়া আলোক উঠিয়া পড়িল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রসভঙ্গ হয়ে গেল; দলের সবাই ওদিকে কালিয়া মুড়ি-ঘণ্টের ফরমাস দিচ্ছে, এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথেও মন

বসানো অসম্ভব। শেষ করে আমার হাতে দিস কাগজটা, যারই হোক চেয়ে নিয়ে যাবে। ওঠ্ বাঁটুল, জমবে না।"

বাঁটুল গভীর মিনতিভরে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "শৈল ভাই, আমার জন্যে একটা জায়গা কোন রকম করে আটকে রাখিস আর মিনিট কয়েকের মধ্যে এসে পড়ব। একটু তাড়াতাড়ি করিস অখিল।"

খানিকটা উষ্মার সহিতই মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "বলেছিলাম এইজন্যে যে করিস নি আরম্ভ এখন। নে, শেষ কর্ বাপু শীগ্‌গির···হ্যাঁ, তারপরে কি হ'ল?" হাতে কপালটা চাপিয়া গভীর অভিনিবেশের ভঙ্গিতে শুনিতে লাগিল। এই নূতন অভিজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু মন্থর গতিতেই গিয়া বিমলের পাশে একটা আসন দখল করিলাম। বাঁটুল কি শপথ করিয়া রাতারাতি রবিভক্ত হইয়া উঠিল?

কচুরি পাঁপরভাজা শেষ করিয়া চাটনিতে হাত দিয়াছি, এমন সময় বাঁটুল আসিল।

দলের সকলেই যে আহারটা উপভোগ করিতেছিল, এমন বলা যায় না। বাঁটুল সবার জিভেই বিস্বাদ আনিয়া দিয়াছে, আলোক বিমল প্রভৃতি যে যত বড় ভক্ত, তাহার জিভে তত বিস্বাদ।

আমাদের সামনে হারাণ-মাস্টার বসিয়াছিলেন। লুচির সঙ্গে মাছের কালিয়ার একটা দলা মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলেন, "তোরা সবাই রয়েছিস, বৈঁটলকে দেখি না যে? পেট ঠিক আছে তো? অবশ্য না থাকলেও সে ছাড়বার পাত্র নয়। রাখালই বা কোথায়?"

বলিলাম, "অখিল রবীন্দ্রনাথের একটা নতুন গল্প পড়ছে, বাঁটুল বসে বসে শুনছে!"

মুখে গ্রাসটা দিয়াছিলেন, দারুণ বিস্ময়ে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৈঁটল!···রবীন্দ্রনাথ!"

আর কিছু বলিবার আগেই বিষম লাগিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন।

বিমল আমার পানে চাহিয়া বলিল, "থাম্, হয়েছে। শুনছে যা তা আমিই জানি, একটা স্টাইল—"

কে একজন বলিল, "বাঁটুলের স্টাইল হয়েছে! সেটাও তো একটা মস্ত আশার কথা।"

রাজেন বলিল, "সিন্সিয়ারও হতে পারে। বাঁটুলের মত ছেলে যে স্রেফ স্টাইলের জন্যে থ্যাট ভুলে বসে থাকবে, আমার বিশ্বাস হয় না। ওসব ওপরে ওপরে হাঁদা লোকদের ধাত বোঝা দুষ্কর, ভেতরটা ওদের অনেক সময় এমন সরস থাকে—"

যতীন দত্ত বলিল, "তোমরা গোড়াতেই একটা মস্তবড় ভুল করেছ। যার জিভে, শুধু জিভে বলি কেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোনটায় রসজ্ঞান আছে, তার সাহিত্যরসের জ্ঞানও নিশ্চয়ই থাকবে। স্থূলটা রয়েছে অথচ সূক্ষ্মটা নেই, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না; হয় লোকচক্ষুর আড়ালে আছে।"

হাওয়াটা প্রশংসার দিকে বহিল—

"না না, তোমরা কেউ জান না। আমি জানি বেঁটলের স্টাডি আছে; শুধুই ডিস্পেপ্সিয়া, নেমতন্ন, রাখাল আর অমাবস্যা-পূর্ণিমের হিসেব নিয়ে পড়ে নেই।"

"কার কথা বলছেন, বাঁটুলের? রবিবাবু, ওর মোস্ট ফেবারিট অথর, আমি নিজে কাঁড়ি কাঁড়ি বই যুগিয়েছি।"

যতীন দত্ত এক খাবলা চাটনি মুখে পুরিতে যাইতেছিল। বলিল "তোমরা এত আশ্চর্য কেন হচ্ছ আমি বুঝতে পারছি না, বাঁটুল এমন কিছু অমানুষিক কাজ করে নি। রবিবাবু আর তাঁর মত বড় বড় প্রতিভাদের অনেকগুলো স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কোন্টা যে কার কাছে অ্যাপীল করবে বলা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে তোমার রবীন্দ্রনাথ আমার রবীন্দ্রনাথ এক নয়, তেমনই বেঁটলের।"

এই সময়টায় হন্তদন্ত হইয়া বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইল। চোখের দৃষ্টি প্রায় পাগলের মত; হা-হুতাসভাবে চারিদিকে চোখ বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর হইতেছে। "তোর জন্যে এই সীট রেখেছি, বাঁটুল"—বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া লইলাম।

এর ওর পাত ডিঙাইয়া বাঁটুল আসিয়া বসিয়া পড়িল। একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "সেরেছে! চাটনি পর্যন্ত হয়ে গেছে!"

একেবারে পুরাদমে বিলম্ব সারিতে লাগিয়া গেল।

বিমল প্রশ্ন করিল, "শেষ পর্যন্ত কি হ'ল রে বাঁটুল?"

"কিসের কি হ'ল?"—বলিয়া উত্তরের দিকে খেয়াল না করিয়া বাঁটুল হাত চালাইয়া চলিল। একবার শুধু সামনে ঝুঁকিয়া এমুড়ো ওমুড়ো দেখিয়া লইল। বেশ বোঝা গেল, রাখালকে খুঁজিতেছে।

আমি বলিলাম, "হবে না চাটনি আরম্ভ? তোকে তখন থেকে ডেকে ডেকে সব হয়রাণ হয়ে—"

বাঁটুল একটা আস্ত লুচি তরকারিতে বোঝাই করিয়া মুখে দিতে যাইতেছিল, মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "মেলা বকিস্ নি শৈল, তোদের সবতাতেই তামাসা। আজ সকাল থেকে পেটটা বাদ সাধবার মতলব করেছিল, রাখালের হেফাজতে যদি কোনমতে সেটাকে সায়েস্তা করে আনলাম তো দোসরা এক ফ্যাচাং এনে হাজির করলে সব!"

সকলেই খাওয়া বন্ধ করিয়া বিস্মিতভাবে বাঁটুলের পানে চাহিল। সত্যই অত্যন্ত চটিয়াছে। বলিলাম, "ফ্যাচাং তুই কাকে বলছিস? তুই তো নিজেই শখ করে বসে রইলি; দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তো বললামও তোকে আগে খেয়ে নিতে।"

ওদিককার বারান্দার ও-কোণে রসগোল্লা দেখা দিল। বাঁটুল তখনও মাছের কালিয়ায়? একবার ওদিকটায় চাহিয়া লইয়া কালিয়ার মুখে

আধখানা পাঁপর ও খানিকটা চাটনি পুরিয়া দিল ; তাহার পর এক রকম ভ্যাংচাইয়াই আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আগে খেয়ে নিতে ! খুব শুভার্থী, থাম্। আরম্ভ করে সবটা না শুনে উঠে এলে আধকপালে ধরত না ? একেতো কানের কাছে কি সব হিজিবিজি পড়ে গেল,—এমনই রগচুটোর টিপটিপিনি বেড়ে গেছে…"

আমরা কয়েকজন মুখ থামাইয়া একরকম চীৎকার করিয়াই উঠিলাম—"আধকপালে ! আধকপালের ভয়ে তুই এতক্ষণ বসে বসে…"

বাঁটুল আবার আমাকে লক্ষ্য করিয়াই খিঁচাইয়া উঠিল, "মিছে বকাস নি শৈল, আমায়,—একে যত সব লুভিষ্টিদের পাল্লায় পড়ে পেছিয়েই গেছি। তোদের সব কথাই ইয়ার্কি বলে মনে হয়,—রাখালে জানে একবার আধকপালে ধরলে কিরকম কাবু করে দেয় আমায় ! এদিকে আবার পূর্ণিমের ঝোঁক চলেছে, তার ওপর আধা-ঘ্যাচড়া করে গল্পটা শুনে একটা কাণ্ড ঘটাই আর কি, ওঁদের ফুর্তিটা বাড়ুক। লোকে একটু নেমতন্ন খেতে আসবে, সেখানেও বাবুদের রবিঠাকুর ! ….দেখ গেরো, রসগোল্লার তিজেলটা আরও ওদিকে আটকে গেল ! মোটা জগন্নাথ, অমর্ত কবরেজ—বেছে বেছে যত সব রাঘববোয়ালগুলো ওখানে একাট্ঠা হয়েছে !…"

* * *

যাহারা এতক্ষণ প্রশংসায় মাতিয়াছিল, মুখ গোঁজ করিয়া আহারে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া উঠিল, কাহারও আর মাথা তুলিবার অবস্থা নাই।

শুধু হারাণ-মাস্টার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বাঁচালি বেঁটুল, এদিকে আমারই কপালে টিপটিপিনি ধরে গিয়েছিল,—কি দারুণ সমস্যাতেই যে এতক্ষণ ফেলে রেখেছিলি !"

[১৩৪৮]



এই গ্রন্থকারের প্রণীত

[illegible]

[illegible]

বাসর

সচিত্র

মূল্য আড়াই টাকা

শিবপুরের গণেশের দলের কাহিনী 'বরযাত্রী' ও 'বাসরে' সমাপ্ত। প্রজাপতি-বিড়ম্বিত মঙ্গলাভিনয় গণেশ ও তাহার শিষ্যবর্গ—ত্রিলোচন, প্রতিবন্দী ঘোঁৎনা, কবি রাজেন, দার্শনিক গোরাচাঁদ, ফুটবলার কে. গুপ্ত, [illegible] চাটুজ্যে, নায়েব মশাই, কালাসিটের জগদা সকলেই প্রচুর হাসি ও আনন্দের খোরাক যোগাইবে। 'বরযাত্রী' প্রত্যেক বরযাত্রীর শোভাবর্ধন করিবে, নব-পরিণীত দম্পতির প্রথম মিলন-বাসর 'বাসর' সহযোগে কলহাস্যে মুখর হইয়া উঠিবে।

আগামী প্রভাত

সচিত্র

মূল্য তিন টাকা

এগারটি গল্পের সমষ্টি। এক একটি গল্প যেন এক একটি রসের ফোয়ারা, শুধু আনন্দ বিলাই ক্ষান্ত হয় না দেয় চিন্তা করিবার প্রচুর খোরাক। 'আগামী প্রভাতে' আগামী কালের ইঙ্গিত আছে

দিনান্দিন

মূল্য আড়াই টাকা

একাধারে উপন্যাস ও গল্প 'দুই-ই-একটান' [illegible] আবার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্রভাবে পড়িলে গল্প। বাংলা সাহিত্যে [illegible] উপন্যাস ও গল্পের [illegible] পরিবেশন সম্পর্কে [illegible]।

[illegible] প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—[illegible]